সুধা হালদার ও সম্প্রদায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন—১৩৬৩/৫৭।

শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত

কল্যাণীয়েষু

সূচীপত্র

সুধা হালদার ও সম্প্রদায়

১

কদিন ধরেই হাত টানাটানি যাচ্ছিল পরেশের। বাজার চড়া। জিনিসপত্রের দাম এত আক্রা যে মাথা ঠিক রাখা শক্ত। বাজারে যাওয়ার আগে রোজই স্ত্রীর সঙ্গে এক চোট ঝগড়া করে পরেশ। বাজার থেকে যখন ফেরে মাছ তরকারির দাম দেখে আরও মাথা গরম হয়। পুঁজিপাটা যা ছিল তা প্রায় সবই শেষ হয়েছে। ঘরে বসে বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও শেষ হয়। আর এ তো পরেশ হালদার। যে পাশ পরীক্ষা দিয়ে কোন সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারেনি, অল্পসল্প গাইতে বাজাতে জানে, তাছাড়া কোন হাতের কাজ শেখেনি। নতুন করে কিছু শেখবার চেষ্টাও নেই। নতুন কোন কাজকর্মকে যেন যমের মত ভয় করে পরেশ। সংসারে কতজনে কত কাজ করে খায়। পেটের জন্যে চিন্তা যার আছে সে মাথা খাটায়। যে তা পারে না সে হাত পা খাটায়, দুখানি হাত দিয়ে মানুষ কত কাজ করে। পুরুষ ছেলের আবার কাজের অভাব আছে নাকি? কিন্তু কোন কাজের কথা বললে পরেশ যেন জঙ্গলে পড়ে, জলে পড়ে। তাকে যেন বাঘে কুমীরে খেতে আসে, চোখ-মুখের এমনি দশা হয় তার। পুরুষ মানুষের এই ভয় দেখে সুধা আগে আগে হাসত। আজকাল আর হাসতে পারে না। এখন তো সে আর একা নয়। দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছে। আরো একটি আসছে। এখন পরেশকে ভয় পেলে চলবে কেন? এখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে কতজনে বল ভরসা সাহস পাবে।

পাথুরিয়াঘাটার সরু গলির মধ্যে দুখানা মাত্র ঘর। তারই

ভাড়া গুণতে হয় মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আজকের এই কথান্তরটা ভাড়া নিয়েই শুরু হয়েছিল।

সুধা বলেছিল, 'কই, ভাড়া দিলে না। মাস যে শেষ হয়ে এল। বাড়িওয়ালা ব্রজবাবু এরই মধ্যে তিন দিন তাগিদ দিয়েছেন?'

পরেশ বলেছিল, 'দিক গিয়ে। তার কি। সে তো তাগিদ দিয়েই খালাস।'

সুধা হেসে বলেছিল, 'ওরা ঘর ভাড়া দিয়েছে, ভাড়ার জন্যে তাগিদ দেবে না? আমাদের মাসী যে মাসপয়লা দিনে গুণে গুণে ভাড়ার টাকাটা আদায় করে নিত।' বলে সুধা জিভ কেটে বড় লজ্জিত হয়ে পড়ে। পূর্বস্মৃতি সে আজ মনে করতেও চায়নি, বলতেও যায়নি। মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে। বাড়ি ঘর যারা ভাড়া দেয় তারা যে অমন কড়া তাগিদই দিয়ে থাকে, আর ভাড়াটেকে সে টাকা হাসিমুখে নিয়মিত জুগিয়েও যেতে হয় স্বামীকে এই তত্ত্বটা বুঝিয়ে বলবার জন্যেই দৃষ্টান্তটা হঠাৎ মুখের আগায় এসে পড়েছে সুধার। কিন্তু তাতে এমনই বা কোন দোষ হয়েছে। ঘরে তো পরেশ ছাড়া আর কেউ নেই। সে তো সব জানেই। নিজেই দেখেছে শুনেছে। কত মাসীকে দেওয়ার জন্যে কত বোনঝির বাড়িভাড়া নিজের হাতে জুগিয়েছে। পরেশের তো কিছু আর অজানা নেই। পরেশ ছাড়া ঘরে আছে আর দুটি ছেলেমেয়ে। কোলের দেড় বছরের ছেলেটি এখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। চার বছরের মেয়েটি সারা বাড়ি ভরে ঘুর ঘুর করছে আর নিজের মনে গাইছে, 'মন দিলে না বঁধু।'

ময়নার গলাটা ভালোই হবে। আর যখন যে গান শোনে তাই ও সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিতে পারে। কিন্তু ও গান গাইলেও ওসব কথা বুঝবার কি আর তার বয়স হয়েছে। কম পক্ষে আরো ন দশ বছর লাগবে। ততদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে সুধার। জিভ

আর মুখ আয়ত্তে আসবে। কোন বে-ফাঁস কথা আর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসবে না।

কিন্তু কথাটা শুনেই পরেশ চোখ তুলে কটমট করে তাকিয়েছে স্ত্রীর দিকে। যেন এতক্ষণ পরে সে সুধাকে বাগে পেয়েছে।

পরেশ বলল, 'ফের ওই সব কথা? লজ্জা করে না তোমার? তিন সন্তানের মা হতে যাচ্ছ, তবু মুখের লব্‌জ গেল না?'

সুধা আরো লজ্জিত হল, একটু হেসে বলল, 'মাফ করো। ঘরে তো বাইরের কেউ নেই। তুমি ছাড়া আর তো কেউ শুনতে পায়নি।'

'নাই বা পেল। ভদ্রলোকের পাড়া। আমিও ভদ্রলোক। পাঁচ বছর ধরে স্বামী-স্ত্রী হয়ে বাস করছি। তবু তুমি ওসব কথা তুলবে? ঘরের মঙ্গল অমঙ্গল ছেলে মেয়েদের ভালোমন্দ বিবেচনা করবে না?'

সুধা বলল, 'বললামই তো বাবা, আমার ঘাট হয়েছে। আর বলব না। নাও এবার বাড়িভাড়ার কি করবে তাই কর। আমি বলি কি, দুখানা ঘর রেখে আর দরকার কি। বাইরের ঘরখানা ছেড়ে দাও। পঁচিশ টাকা ভাড়া বাঁচবে।'

একথা সুধা অনেকদিন ধরেই বলে আসছে। ভাড়া দিতে যখন এত কষ্ট ও ঘরখানা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু পরেশ জানে—ওঘরের শুধু এক নম্বর নয় তিন চার নম্বর দরকার আছে। প্রথম হল ভদ্রলোকের একখানা বসবার ঘর রাখতেই হয়। তার সদর অন্দরের মধ্যে একটা মোটা কাপড়ের গাঢ়রঙের পর্দা না টাঙিয়ে রাখলে চলে না। পর্দার ওপাশে গ্রীনরুম, পর্দার এপাশে স্টেজ। বন্ধুবান্ধব যারা আসে তাদের বসবার জন্যে বাইরের ঘরখানা, পুরোন চেয়ার আর কৌচ কিনে এনে ভালোভাবেই সাজিয়েছে পরেশ। একটা করে খবরের কাগজও সে রাখে। তাতে পাড়ায় তার মর্যাদা বেড়েছে। কিন্তু শুধু বসবার, গল্প করবার, কাগজ

পড়বার ঘরই নয়, এ ঘর একই সঙ্গে তার অফিস আর রিহার্সাল রুম। বাইরে 'সুধা হালদার ও সম্প্রদায়' নামের ছোট সাইনবোর্ডটি এখনো দেয়ালের গায়ে আটকানো রয়েছে। চার পাঁচ মাস এই দলের কাজকর্ম এখানে বেশ চলে। দরকার মত এদলের রূপ বদলায়। কখনো হয় অপেরা পার্টি, কখনো নাচ, কখনো বা লঘু রাগসঙ্গীত আর আধুনিক সঙ্গীতের দল। যখন যে রকম মেয়ে পাওয়া যায়। দলের বেশির ভাগ মেয়ের যে ধরনের যোগ্যতা থাকে, সেই অনুযায়ীই দলকে বদলে নিতে হয়। তাতে দলের নামটা ঠিকই থাকে আর অধিকারীও বদল হয় না। আজকাল আর অধিকারী বলে না। পরেশও নিজেকে ম্যানেজারই বলে। সে একই সঙ্গে এই দলের ম্যানেজার প্রোপ্রাইটার ফাউণ্ডার—সব। এই দলের জন্যেই বাইরের ঘরখানাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু সুধা বলে 'ওই ঘরেরও দরকার নেই। তুমি এসব ছেড়ে দাও, আমি যেমন সেসব ছেড়ে এসেছি তেমনি তুমিও তোমার পেশা বদলাও।'

কিন্তু বারবধূর পক্ষে কুলবধূ হওয়া যত সহজ, পুরুষের পক্ষে এক পেশা ছেড়ে আর এক পেশায় যাওয়া তত সহজ নয়। সব ব্যবসা সবাইর হাতে জমে না। আর চাকরি-বাকরি তো সবই পরের হাতে।

মাত্র চার পাঁচ মাসের মরশুম। বর্ধমান বীরভূম মেদিনীপুর জেলা থেকে শুরু করে উড়িষ্যা বিহারের ছোট ছোট শহরে গ্রামে পরেশ তার দলবল নিয়ে যায়। বাংলা দেশের চেয়ে বাংলার বাইরে থেকে যে সব বায়না আসে সেইগুলি রাখতেই বেশি আগ্রহ পরেশের। গাঁয়ের যোগী ভিখ পায় না। মান নেই যার কাছে, মান নেই গাঁর কাছে। দেশে প্রতিযোগিতা বেশি—টাকা কম—মান-সম্মানও কম। কিন্তু বাইরে পরেশ বাঙালীর সংস্কৃতির, তার নৃত্য আর গীত শিল্পের ধারক বাহক বলে নিজের পরিচয় দেয়। আর

এখানকার পচী পদী হারানী কুড়ানীকেও ঘষে-মেজে ওসব অঞ্চলে উর্বশী মেনকা বলে চালিয়ে দিতে পারে পরেশ। যতদিন থাকে তাদের আদরযত্নে পান-ভোজনে দিব্যি আরামে দিন আর রাতগুলি কাটিয়ে দিয়ে আসে। ফিরে এসে বছরের বাকি সময়টা প্রায় পায়ের ওপর পা তুলে খায়। শেষের দিকে অবশ্য টানাটানি পড়ে। তখন বন্ধুবান্ধব কি মহাজনের কাছে ধারকর্জের জন্যে ছুটতে হয়। প্রায় গত পনের বছর ধরে এই অনিশ্চিত জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে পরেশ। এই দীর্ঘকালের অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া কি সহজ? আর ছেড়ে দিলেই বা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য জীবিকা তাকে কে দেবে?

পরেশ স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'তুমি ভেব না, ভাড়ার টাকা আমি দু' একদিনের মধ্যেই জোগাড় করে আনব।'

সুধা বলল, 'আর খোরাকি?'

পরেশ বলল, 'হবে হবে, সব হবে। তুমি ভেব না।'

বাইরের ঘরে এসে কৌচে ঠেস দিয়ে বসল পরেশ। সুখাসন এখন নেই। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। পুরোন বাজার থেকে সস্তায় কিনেছিল জিনিসটা, এখন পস্তাচ্ছে।

পরেশ বসে বসে বিড়ি টানতে লাগল। ভাবনার আর শেষ নেই। অর্থ চিন্তাটাই প্রধান এবং একমাত্র। পেশা বদলাবার চেষ্টা সে যে একেবারে না করে দেখেছে তা নয়। বিনা মূলধনে যা করা যায় সেই দালালীও করেছে। জমির দালালী, আসবাব-পত্রের দালালী, ইনসিওরেন্সের দালালী—সবই দু একবার করে পরখ করেছে। কিন্তু কিছুতেই সুবিধা হয়নি। স্টেশনারি দোকান দিয়েছিল একবার। কিন্তু এমন লোকসান যেতে লাগল, আর যে লোকের হাতে বেচাকেনার ভার দিয়েছিল সে এমন দুহাতে চুরি করতে লাগল যে পাঁচ ছ মাসের মধ্যে দোকান তুলে দিয়ে তবে রেহাই পেল পরেশ। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে মাথায় করে মোট

তো আর বইতে পারে না—কি রিক্সাও টানতে পারে না। যা স্বাস্থ্য তাতে বাস ট্রামের কণ্ডাক্টরি করবার জো-ও নেই। তাই পরেশ যা করে আসছে তাই তাকে করে যেতে হবে। কিন্তু একথা সুধা কিছুতেই বুঝতে চায় না।

দোরের সামনে পিওন এসে দাঁড়াল। চিঠিটা সে বাক্সে ফেলবার আগেই পরেশ তার হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিল পোস্টকার্ডটা, বলল, 'দাও, হাতেই দাও।'

চিঠিটা আগাগোড়া পড়বার পর খুশিতে ভরে উঠল পরেশের মুখ। প্রত্যাশিত সুখবরই এসেছে। ভুবনেশ্বর থেকে তার এজেন্ট মুকুন্দ মহাপাত্র লিখেছে—পরেশ যেন দু-চার দিনের মধ্যেই তার দল নিয়ে রওনা হয়ে পথে আর কোথাও দেরি না করে একেবারে সরাসরি ভুবনেশ্বরে গিয়ে হাজির হয়। মুকুন্দ এত বায়না জোগাড় করেছে যে তিন চার মাস ভুবনেশ্বর, কটক আর পুরী এই তিন জেলার গ্রাম আর গঞ্জেই পরেশ কাটিয়ে দিতে পারবে। গতবার যে গাওনা করে গিয়েছিল, তাতে সুধা হালদার ও সম্প্রদায়ের বেশ নাম হয়েছে। চাহিদা তারও বেড়েছে। আর্টিস্টদের রূপ গুণ যেন দলের সেই মর্যাদা রাখতে পারে। যাতায়াত রাহা খরচা বাবদ একশ টাকা এম-ও করে পাঠাচ্ছে মুকুন্দ। পরেশ যেন রওনা হতে বেশি দেরি না করে। টাকার জন্যে ভাবনা নেই। এসে পৌছলে খাই খরচা, বাসা ভাড়া বাবদ আরো টাকা পাবে।

মুকুন্দ মহাপাত্র খুব নির্ভরযোগ্য এজেন্ট। পরেশের কাছ থেকে সে টাকায় ছ আনা কমিশন পায়। নিজের স্বার্থেই সে বায়নাপত্র জোগাড় করে। তাই তার কথায় অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। সমস্যার সমূহ নিরসন হল দেখে পরেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এবং স্ত্রীকে সুখবরটা দেওয়ার জন্যে ভিতরে চলে গেল।

কিন্তু যার নামে দল, যার নামটা নানা উপলক্ষে দেশ-বিদেশের লোকের মুখে মুখে ফেরে সে খুশি হল কই।

খানিক আগে থলিতে করে যে অল্প-স্বল্প মাছ তরকারি এনে দিয়েছিল পরেশ, সে সব কুটে ধুয়ে সুধা ততক্ষণে রান্নার ব্যবস্থা করছে।

পরেশ এসে বলল, 'শুনছ, মুকুন্দ একশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, আর চিন্তা নেই।'

সুধা মুখ নাড়া দিয়ে বলল, 'একশ টাকা পাঠিয়েছে তবে আর কি, মহারাজা হয়ে গেছ! আমি তোমাকে হাজার বার বারণ করিনি ওই মাগীগুলিকে নিয়ে তুমি আর বেরোতে পারবে না? ও ব্যবসা তোমাকে ছাড়তে হবে। তবু তুমি গোপনে গোপনে মুকুন্দের সঙ্গে লেখালেখি করতে গেছ কোন আক্কেলে? আমার নাম ধুয়ে খাবে, কিন্তু আমার একটা কথাও কি কানে তুলবে না? আচ্ছা জ্বালায় পড়েছি।'

পরেশ হেসে বলল, 'যা বলেছিস সুধা। তোর নামের গুণেই তো আছি।'

মনে যখন বেশ ফূর্তি হয়, অকূল ভাবনার কিনারা পাওয়া যায়, তখন স্ত্রীকে তুমি ছেড়ে তুই বলেই ডাকে পরেশ। তাতে ওর সঙ্গে যেন আরো অন্তরঙ্গ হওয়া যায়। তুমিটা যেন বড্ড পোশাকি। তুইটা আট-পৌরে, একেবারে দিলখোলা ডাক।

পরেশ মনের খুশিতে বলে চলল, 'সত্যিই তোর নামের গুণ আছে সুধা! তোর নামের গুণেই তো তরে যাচ্ছি। নইলে কি আর তরবার জো ছিল?'

বিড়ির শেষটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরেশ গুনগুনিয়ে গান ধরল, 'সখি তব নাম লয়ে আজ্ঞাবহ হয়ে ঝাঁপ দিলাম আজি পরীক্ষা সাগরে।'

গানশুনে ময়না এসে বাপের কাছে দাঁড়িয়েছিল। ছোট সাদা সাদা দাঁত কটি বার করে হেসে বলল, 'বাবা, আমিও গাইতে পারি। গাইব?'

পরেশ বলল, 'গা দেখি মা, গা তো।'

সুধা ধমক দিয়ে উঠল, 'থাক থাক। বাপ হয়ে মেয়েকে কি সব গানই শেখাচ্ছ। আর আমি কিছু বললে দোষ হয়, বাবুর তাতে জাত যায় অপমান হয়। এখন নিজে যে বেলেল্লাপনা করছ তার কি।'

পরেশ বলল, 'বেলেল্লাপনা নারে সুধা, একে বেলেল্লাপনা বলে না। ময়নার যা বয়স তাতে ওর কাছে সব নামই হরিনাম, সব গানই ভালো গান। সেই যে কথায় আছে না—আপ ভালো তো জগৎ ভালো। ময়না, আমার ময়না পাখি, পড়তো, আপ ভালো তো জগৎ ভালো।'

ময়না বাপের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করল, 'আপ ভালো তো জগৎ ভালো।'

সুধা কড়ায় ডাল চাপাতে চাপাতে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কত যে ভালো তুমি—কত যে গুণধর পুরুষ—তা তো আমার জানতে বাকি নেই। বাইরে যাবার কথা শুনেই তোমার মন উড়ু উড়ু হয়েছে। গলা দিয়ে সুর বেরোচ্ছে। আনন্দের আর সীমা নেই তোমার। কিন্তু আমার কথাটা একবার ভেবে দেখতো, আমি কী নিয়ে থাকি।'

অভিমানে মুখখানা ভার ভার হল সুধার। বয়স তিরিশ ছাড়িয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে দেহের বাঁধুনি বেশ আঁটসাঁট আর মজবুতই আছে। সুন্দরী নয় সুধা। গায়ের রঙ কালো। নাক চোখ একেবারে নিখুঁৎ না হলেও মুখের ডৌলটা মন্দ নয়। কাজ চালাবার মত নাচ গান দুইই শিখেছিল। কিন্তু এখন দেহ ভারী হয়ে যাওয়ায়, ছেলেপুলে হওয়ায় পরেশ ওর নাচটা বন্ধ করে দিয়েছে। গানের গলা এখনো আছে। কিন্তু ঘরের বাইরে ওকে গাইতে দেয় না পরেশ। বলে, 'তুমি এখন ঘরের বউ, যা করবে ঘরে বসে কর।'

সুধার অভিমান-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে পরেশ একটু হাসল, 'কী নিয়ে থাকি মানে। ঘর আছে, সংসার আছে, ছেলেমেয়ে রয়েছে। মেয়েমানুষ যা যা নিয়ে থাকে তার সবই তো তোমার আছে সুধা! সবইতো দিয়েছি। তবু ও কথা কেন বলছ।'

সুধা বলল, 'বলছি যে কেন তা তুমি কি করে বুঝবে। মেয়েমানুষের প্রাণ নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলে বেড়াও। তার প্রাণের যাতনা তোমরা কি বুঝবে?'

সুধার মুখে এ ধরনের কথা শুনে পরেশ একটু অবাক হল। পাঁচ বছর আগেও সুধা যেভাবে জীবন কাটিয়েছে তাতে প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ সুধার কম ছিল না, সাধারণ পুরুষের চেয়ে বরং বেশিই ছিল। সে সব খবর যে পরেশ একেবারে না রাখে তাও নয়। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর ধরে ঘরসংসার করে সুধা যেন একেবারে চিরকালের কুলবধূ হয়ে গেছে। কিন্তু পূর্বজীবন যেমনই হোক না কোন মেয়ে যদি অমন কাতরভাবে প্রাণের যাতনার কথা বলে পুরুষের মন না গলে পারেনা, বিশেষ সে পুরুষ যদি স্বামী হয়, সুখেদুঃখে ঘরসংসার করে, ছেলেমেয়ের বাপ হয়—তাহলে কি আর তার মন না গলে পারে! পরেশেরও মন গলল। ছোট জলচৌকিটা টেনে নিয়ে স্ত্রীর গা ঘেঁসে বসে বলল, 'খুব বুঝি সুধা, খুব বুঝি। কিন্তু পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা। সেই জ্বালাতেই যে ছুটে বেরোতে হয়। শুধু তো নিজেরা দুজন নয়, ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদেরও তো খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

সুধা বলল, 'তাকি আর জানিনে? কিন্তু তোমাকে দুদিনের জন্যেও চোখের আড়াল হতে দিতে আমার ইচ্ছে হয় না। আর এ তো মাসের পর মাস। ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে দিয়ে তুমি আমাকে বেঁধে ফেলে মজা দেখছ। আমার পাখা দুটো কেটে নিজের পকেটে গুঁজেছ। কিন্তু তাই বলে তোমার ওড়া তো বন্ধ

হয়নি। তোমার সঙ্গে এমন চুক্তি তো ছিল না। আমি একা ঘরে লক্ষ্মী বউ হয়ে থাকব, আর তুমি বেপরোয়া হয়ে আগের মতই একদল মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে—এমন শর্তে তো আমি রাজী হইনি, কোনদিন হবও না।'

পরেশ এবার বিরক্ত হয়ে বলল, 'ভালো জ্বালা! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল ওই এক কথা। ও ছাড়া তোমার আর কি কোন কথা নেই?'

সুধা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফের রান্নায় মন দিল। স্বামীর কথার কোন জবাব দিল না।

পরেশও আর দেরি না করে ছিটের শার্টটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার এখন অনেক কাজ।

২

পরেশের দলটা যে সারা বছর একটি শতদলের মত থাকে, তা নয়। বরং পাপড়িগুলি ইতস্তত কোথায় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে—বছরের মরশুমের সময় ছাড়া অন্য সময় তার কোন আর খোঁজই মেলে না। মরশুমের শুরুতে পরেশ আবার এক একটি করে গাইয়ে জোগাড় করে, তাদের বহু টাকা রোজগারের লোভ দেখায়, নামযশের প্রলোভন সামনে তুলে ধরে। বেরোবার সময় দলের বন্ধনটা ঠিক থাকে, বিদেশে একই বাসায় একই হোটেলে আহার বাস এবং একই আসরে গান বাজনার ভিতর দিয়ে সেই সম্পর্কের বন্ধনটা আরো শক্ত হয়—কিন্তু কলকাতায় আসবার পর ফের আবার তা টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়ে। আবার তাদের কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড় করতে হয়। এমনি বছরের পর বছর চলছে। এতে কোন ক্লান্তি নেই পরেশের। প্রতি বছরই নিত্য-নতুন লোক, নিত্য-নতুন মেয়ে। দলের এই অদল বদলে আজকাল আর বিশেষ কোন আফশোস নেই পরেশের। দলের অনিত্যতাটাই নিত্য। যেমন জীবনের—ট্রাম-বাসে এক একদিন এক এক দল যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। তাই নিয়ে কি কেউ হা-হুতাশ করে? পরেশও তার এই দলের লোকদের কাজের যন্ত্র হিসাবেই দেখে। কাজের সম্পর্ক, টাকা-পয়সা লেন-দেন ভাগ-বখেরার সম্পর্ক ছাড়া তাদের সঙ্গে পরেশের আর সম্পর্ক থাকে না। মাঝে মাঝে অবশ্য ব্যতিক্রম হয়। যেমন সুধার বেলায় হয়েছিল। কাজের যন্ত্র মাঝে মাঝে তার-যন্ত্রের মত বাজে আবার তা কখনো কখনো অন্য রকম যন্ত্রণার কারণও হয়ে ওঠে। ভাবের সম্পর্ক রসের সম্পর্ক কখন যে আস্তে

আস্তে শুধু নীরস দরকারের সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়ায় টের পাওয়া যায় না। যখন টের পায় লোকে অবাক হয়ে থাকে।

লালবাজারের মোড়ে এসে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল পরেশ। খানিকটা এগোলেই ডান দিকে নিমাই সরকারের ফার্নিচারের দোকান। সরু এক ফালি ঘেরা জায়গা সুড়ঙ্গ পথের মত বহু দূর চলে গেছে। সেই তুলনায় ঘরখানার প্রস্থ নেই বললেই চলে। দোকানে ঢুকবার আগে বাইরে এক মুহূর্ত চুপ করে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইল পরেশ। বিড়িটা হাতে করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। নিমাই নিজের হাতেই একমনে একটা খাটের পায়া পালিশ শুরু করেছে। পিছনের গুদামে খাট আলমারি চেয়ার টেবিল আরো অনেক জিনিস আছে। ডানদিকে ঠিক রাস্তার সামনে ছোট এক জোড়া চেয়ার টেবিল। গোটা দুই খাতা, দোয়াত-কলম। নিমাই যখন বাবু হয়ে বসে, খদ্দেরের অর্ডার নেয়, টাকা নিয়ে রিসিট লিখে দেয়, তখন ওই চেয়ার টেবিলের দরকার হয়। অন্য সময় নিচে বসে নিজের হাতেই কাজ করে নিমাই। সিরিষ কাগজ দিয়ে ফার্নিচার ঘসে, পালিশ করে। পরেশের মনে পড়ে নিমাইয়ের বাবা নিকুঞ্জ সরকারও তাই করতেন। নিজের হাতে পালিশ, নিজের হাতে বেচা-কেনা করতেন তিনি। নিমাই সব দিক থেকেই একেবারে বাপকা বেটা হয়েছে। দেখতেও সেই রকম লম্বা। সেই চোয়াল, মুখ, নাক চোখ হাত পায়ের গড়নও একই রকম। নিজের চেহারায়, বেশে বাসে পেশায় মরা বাপকে বাঁচিয়ে রেখেছে নিমাই।

কিন্তু পরেশের বাবার চেহারা পরেশের নিজের মতই ছিল কিনা এখন আর তা তার মনে নেই। খুবই অল্প বয়সে তার বাবা মা মায়া কাটিয়েছেন। শোনা যায়, তাঁদের দুজনের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক ছিল না। তবু বাবা ভদ্রলোকের জীবিকা—মার্চেন্ট অফিসের কেরানীগিরিই শেষ দিন পর্যন্ত করে গেছেন। সে পথ ধরবার মত

বিদ্যাবুদ্ধি পরেশের হয়নি। বহুদিন তাই পথে পথেই কেটেছে। বাপের বৃত্তি না পেলেও প্রবৃত্তি যে একেবারে পায়নি পরেশ, সে কথা জোর করে বলা যায়না। হয়তো অফিসে বসে কলম পিষতে পিষতে তাঁর মন যে বাঁধন ছেঁড়া যাযাবরের স্বপ্ন দেখত পরেশের বাস্তব জীবন সেই স্বপ্নই খানিকটা সফল করেছে।

বিড়ির টুকরোটা বাইরে ফেলে দিয়ে পরেশ তার বন্ধু নিমাইয়ের দোকানের ভিতরে ঢুকে তার মাথায় আলগোছে একটা চাঁটি মেরে বলল, 'কি রে খুব পালিশ-টালিশ করছিস যে। কার ফুলশয্যার খাট সাজাচ্ছিস রে নিমু? এই অগ্রাণ মাসের মরশুমে কটা বিয়ের অর্ডার ধরলি?'

নিমাই একটু চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, তারপর পরেশকে দেখে হেসে বলল, 'ও তুই? বোস বোস। দে বিড়ি দে।'

মালিকের বসবার জন্যে সেই হাতলহীন রাজসিংহাসনখানা ছাড়াও একটি টুল আছে বসবার। পরেশ সেই টুলটা টেনে নিয়ে বলল, 'বাঃ, মজা মন্দ না, এলাম তোর দোকানে—আর তুই বিড়ি চাচ্ছিস আমার কাছে।'

তারপর পকেট থেকে দুটো বিড়ি বার করে একটা বন্ধুর হাতে দিল পরেশ, আর একটা নিজে ধরাল।

নিমাই পালিশের কাজ ফেলে রেখে হেসে বলল, 'আরে ছোট বড় সব নেশার ব্যাপারে তুই-ই তো হলি মহাজন। আমরা কেবল পালিশ করে করেই গেলাম। আর ফুলশয্যায় নিত্য-নতুন ফুল-কুমারী কোলে করে তুই এক জীবন ভোর করে দিলি।'

পরেশও হাসল, 'যা বলেছিস। জীবনটা একটা ফুল-শয্যার রাতই বটে। কিন্তু ফুলও একটা নয়, শয্যাও একখানা হলে চলে না। তবে তোর মুখে এ আফশোস কেন। তোরা শালা তো দু পুরুষ ধরে জীবনে উন্নতি করবার জন্যে আদা নুন খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছিস, দু বেলা কাঁচকলা সেদ্ধ দিয়ে সাত্ত্বিক আহার করছিস,

পঞ্জিকার দিনক্ষণ দেখে বউকে সোহাগ করছিস, আর ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কে হাত বুলাচ্ছিস। তোদের সঙ্গে কার তুলনা।' পিঠ চাপড়ে পরেশ বন্ধুকে একটু আদর করল তারপর একটু হেসে গলার স্বর মোলায়েম করে বলল 'আমাকে শ দুই টাকার একটা বেয়ারার চেক লিখে দে তো নিমু। বড্ড দরকার।'

নিমাই সঙ্গে সঙ্গে চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলিস কি! টাকা কোথায় পাব। আমাকে কুচি কুচি করে কাটলেও তো দুশো টাকা বের হবে না।'

পরেশ বলল, 'আরে তা কি আর জানিনে? পকেটমারদের মত ধরা পড়লে টাকা তুই গিলে ফেলতে পারিস নে। টাকা যেখানে রাখবার সেখানেই রাখিস। কিছু ওঠে গয়না হয়ে বউয়ের হাতে গলায় কানে। আর বাকিটা ব্যাঙ্কে। সেই ব্যাঙ্ক থেকেই টাকাটা তোকে তুলে দিতে হবে।'

নিমাই তার পালিশ মাখা হাত দুখানা জোড় করে বলল, 'মাফ করিস ভাই। এবার আর একটা পয়সাও আমি দিতে পারবনা। আমার নিজেরই ভারি হাত টানাটানি যাচ্ছে। কাজ কারবার কিচ্ছু নেই। বেচা কেনা বন্ধ। শালার পালিশওয়ালা দুদিন ধরে আসছে না। দৈনিক রেট নিয়ে ঝগড়া করে চলে গেছে। অথচ যে করেই হোক, মাল আমাকে পরশুর মধ্যে ডেলিভারি দিতে হবে। যা অশান্তি আর ঝামেলায় আছি, তা আর কহতব্য নয়। তোর কি মেয়ে নাচিয়ে পয়সা করে বেড়াচ্ছিস। বেছে বেছে বিয়ে করেছিস এক বাইজীকে। সেও দু-হাত দু-পা দিয়ে রোজগার করছে। তোর পয়সার অভাব কিসে। তুই কেন টাকা চাইতে এসেছিস আমার কাছে?'

পরেশ রাগ করলনা। হেসে নিমাইর পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলল, 'এসেছি তুই আমার নেংটাকালের বন্ধু বলে। একই সঙ্গে স্কুল পালিয়েছি, অল্প বয়সে বিড়ি-সিগারেট মদ-মেয়েমানুষ

ধরেছি। তারপর তুই শালা ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে সব ছেড়ে দিলি, আর সবগুলি কুগ্রহ আমাকে জড়িয়ে রইল। তবু তুই আমার প্রাণের বন্ধু, একমাত্র দোসর। তোর বিপদ আপদে আমি আছি, আমার বিপদ আপদে তুই।'

নিমাই ফের আবার পালিশের কাজে হাত দিল। পরেশ বলতে লাগল, 'তাছাড়া আমি কবে সাউকারি রাখিনি তাই বল। টাকা যেদিন ফেরৎ দেব বলেছি তার ছুদিন আগে ছাড়া পরে দিইনি। তুই যদি এবার সুদ চাস, তাও স্পষ্ট করে বল সেই সুদই আমি দেব।'

নিমাই মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বাজে বকিসনে। আমি অত দিতে পারব না। তবে যা পারি তা দেব। কাল আসিস।'

পরেশ খুশি হয়ে উঠে নিমাইর মাথায় আর একটা চাঁটি মেরে বলল, 'এইতো চাই ওস্তাদ। সাবাস, আবার কি। তুই যা দিবি তাই ঢের। তুই হাত ঝাড়লেই আমার কাছে পর্বত। জানিস এবার আমার নারী বাহিনী নিয়ে প্রথমেই উড়িষ্যায় যাচ্ছি। এমন সব উর্বশীদের নিয়ে যাব—তাদের দেখে স্বয়ং কাঠের জগন্নাথের চিত্তও চঞ্চল হয়ে উঠবে। তুই শালা কাঠুরে, তোরই কিছু করতে পারলাম না। তোর ব্যবসা কাঠের, চেহারা কাঠের, প্রাণটা কাঠ দিয়ে তৈরি। তুই একটা জাত কাঠ-ঠোকরা। কাঠের ব্যবসায় তোর উন্নতি হবেনা কেন?'

নিমাই হেসে বলল, 'বেশ আছিস। দে একটা বিড়ি দে।'

বিড়িটা এবার আর বন্ধুর হাতে দিল না পরেশ, তার ছুই ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলল, 'খা যত পারিস বিড়ি খা। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ জয় করে যখন ফিরব, তখন এমনি ক'রে মিনিটে মিনিটে গোল্ডফ্লেক সিগারেট গুঁজে দেব।'

পরেশ এবার বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোকান ঘর থেকে ফুটপাতে নামল।

নিমাই ফের পালিশের কাজে লাগবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে পরেশের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল, তারপর নিজের মনেই বলল, 'বেশ আছে।' চাপা একটা নিঃশ্বাস পড়ল নিমাইর। কেন তা সে নিজেই জানেনা।

বেশ পরেশ ছিল না। কিন্তু মহাপাত্রের চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনও যেন মহাসমুদ্রের মত নেচে উঠেছে। এতক্ষণে নিজের কাজ খুঁজে পেয়েছে পরেশ। শুনতে পেয়েছে কর্ম সমুদ্রের ডাক। তাই এক মুহূর্তে সমস্ত অবসাদ আর নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলে সে উঠে দাঁড়িয়েছে, ছুটে চলেছে সামনের দিকে। যা তার পেশা তাই তার নেশা। বাকি পথটুকু পরেশ পায়ে হেঁটেই চলল। বেলা দশটা। 'ডালহৌসী' যাত্রী ট্রাম-বাসগুলিতে লোক বাদুড়-ঝোলা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পুব-মুখো যানবাহনগুলিতে ভিড় নেই। তার কোন একটায় অনায়াসেই উঠে পড়তে পারে পরেশ। কিন্তু এখন তার হাঁটতেই ভালো লাগছে। বউবাজারের মোড়ে এসে উত্তরমুখী হয়ে কলেজ স্ট্রীটে পড়ল পরেশ। তারপর রাস্তা পার হয়ে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে ঢুকে পড়ল। বড় রাস্তা থেকে ডান দিকের ছোট সরু গলি। কয়েকটি অচেনা বাড়ি ছাড়িয়ে একটি চেনা বাড়ির ভিতরে ঢুকে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে দোতলায় উঠে পড়ল পরেশ।

প্রথমেই মুখোমুখি হল স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে। বাথরুম থেকে স্নান করে চওড়া পেড়ে একখানা শাড়ি পরে মানদা নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, পরেশ অন্তরঙ্গ সুরে ডাকল, 'এই যে মাসী।'

মানদা হেসে বলল, 'বোনপো যে। তারপর কি খবর তোমার?'

পরেশ বলল, 'এই তোমাদের খোঁজ-টোজ নিতে এলাম। বলি আছ কেমন?'

ভালোই ছিল। শিখিয়ে-পড়িয়ে তালিম দিয়ে মেয়েটাকে বেশ তৈরীও করে নিয়েছিল পরেশ। ওর ওপর অনেক ভরসা করেছিল। গেল মাথায় বাড়ি দিয়ে। 'অন্য ব্যবসা কর, অন্য কাজ-কর্ম কর' বলে স্থধা এমন উত্যক্ত করেই তুলেছিল যে এদিকে আর খোঁজ-খবর নিতে পারেনি পরেশ। টাকা ধারের চেষ্টায় এখানে ওখানে ছুটে বেড়িয়েছে। নানা ফিকির ফন্দিতে দিনগুলি কেটে গেছে। আর সেই ফাঁকে তার দলের রত্ন মায়াকে আর একজন হাত ধরে নিয়ে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল পরেশ। স্ত্রীর ওপর তার দারুণ রাগ আর আক্রোশ হ'তে লাগল।

মানদা তার ভাব-ভঙ্গি দেখে হেসে বলল, 'কি হল ম্যানেজার। তোমার ভাব-টাব দেখে মনে হচ্ছে যেন ঘরের বউ পালিয়ে গেছে।'

পরেশ বলল, 'দলের সেরা মেয়ে বেহাত হয়ে গেলে তার চেয়েও বেশি দুঃখ হয় মাসী। এখন আমি কি উপায় করি। তোমার বাড়িতে আর কোন ভালো মেয়ে-টেয়ে আছে নাকি। গান বাজনা জানে এমন মেয়ে দিতে পার দুটি একটি? মায়ার মত অত ভালো না হলেও কাজ চালিয়ে নেওয়ার মেয়ে।'

মানদা তার কালো কালো দাঁতগুলি বার করে হেসে বলল, 'কপাল আমার। এখন যেগুলি আছে সেগুলি একেবারে কাণা-কড়ি আর অচল পয়সা। গান তো ভালো, গলা চিরে ফেললেও এক ছিটে স্থর বেরোয় না। আর নাচের মধ্যে জানে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কেবল লাথি ছুঁড়তে। পেত্যয় না চাও সন্ধ্যার পর এসে নিজের হাতে বাজিয়ে দেখো। এখন তো সব ঘুমে অচেতন। এখন তো আর দেখা সাক্ষাৎ পাবে না।'

পরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'চলি মাসী।'

মানদা বলে, 'সে কিগো, চা-টা না খেয়েই উঠছ? বোসো বোসো চা আর সিঙ্গাড়া আনাই।'

কিন্তু পরেশ আর দাঁড়ায় না, ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলে,

'এখন আর চা খাবার সময় নেই। সন্ধ্যার পর তো আসছিই, তখন এসে গল্প-টল্প করব। তুমি চান করে এসেছ, এবার সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নাও। আমিও আমার কাজ-কর্ম দেখি গিয়ে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরেশ এসে ফের রাস্তায় নামে। বড় ছেনাল মেয়েমানুষ মানদা। ওব বোধ হয় ইচ্ছা নয়—তার বাড়ি থেকে কোন মেয়েকে আর পরেশের দলের সঙ্গে যেতে দেওয়া। যদিও তার জন্যে মানদাকে কিছু সেলামি দেয় পরেশ, তবু সে খুশি নয়। এমনি করে ভালো ভালো মেয়েগুলি পালালে তার বাড়ি কাণা হয়ে যাবে এই বোধ হয় তার আশঙ্কা। বাইরে গেলেই চোখ কান ফুটে যায়, চালাক চতুর হয়ে যায় মেয়েগুলি। পরেশ নিজেও তা লক্ষ্য করেছে। বাইরে বেরোলেই ওরা জীবনের উন্নতির সিঁড়িতে পা দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কেউ মনের মানুষ নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়, কেউ চলে যায় অন্য গানের দলে, সিনেমা থিয়েটারে—যেখানে বেশি মাইনে, বেশি রোজগারের আশা আছে। সবাই উন্নতি চায় জীবনের। যেদিক দিয়ে পারে সে কয়েক ধাপ উপরে উঠতে চায়। পরেশ নিজের হাতে কত মেয়েকে গড়ল, সুযোগ সুবিধা দিল, তারপর তারা দল ছেড়ে পালিয়ে গেল। পরেশকে কেউ আর পাত্তা দিল না। কেউ তার জীবনের উন্নতির দিকে তাকিয়ে দেখল না। প্রত্যেকেই যে যার নিজের উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত। অন্য কারো দিকে তাকাবার মানুষের সময় কই? একমাত্র ব্যতিক্রম সুধা। তাকে আর যেতে দেয়নি পরেশ। কোথাও পালিয়ে যেতে দেয়নি। নিজের ঘরের মধ্যে সোনার শিকলে তাকে বেঁধে রেখেছে। ছেলে-মেয়ে সংসার সব দিয়েছে তাকে। কিন্তু অমন দেওয়া তো আর সবাইকে দেওয়া যায় না। ছিটে-ফোঁটা অনেককে দেওয়া যায়। কিন্তু ভরা পাত্র ধরে রাখতে হয় একজনের জন্যেই। সুধাকে যে কাঁদে করে রেখেছে, তেমন করে কটি মেয়েকেই বা রাখতে পারে পরেশ? সুধাকেই কি পুরোপুরি রাখতে পেরেছে? স্ত্রী হয়ে

আছে সুধা—তার সন্তানের মা হয়ে আছে। কিন্তু সে এখন দলের আর কোন কাজে লাগে না। তার গলা মোটা ভারি হয়েছে, গান তেমন আর বেরোয় না। দেহ ভারি হয়ে গেছে। নাচতে আর সে পারবে না। পায়ের ঘুঙুর মিঠে বোল দেবে না কোন দিন। দেহের সেই সুঠাম গড়ন, তার সৌন্দর্য আর লাবণ্যও সুধার যেতে বসেছে। সব চেয়ে যা মারাত্মক কথা—সুধা নিজেই এখন নিজের দলের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু সে দলের পক্ষে নিজেই অকেজো হয়ে গেছে, তাই দলকেও সে আর কাজ করতে দিতে চায় না। যেহেতু সে নিজে অকেজো হয়ে গেছে তাই দলকেও ভেঙে চুরমার করে ফেলতে চায়। মেয়েরা এমন হিংসুটেই হয় বটে। বীণা যেমন ছিল, সুধাও তেমনি হয়েছে। কিন্তু হাজার মেয়ে আত্মবলি দিলেও নিজের দলকে ভেঙে দিতে পারবে না পরেশ। দল শুধু তার জীবিকা নয়, তার মুক্তি। তার বাইরে বেরোবার ছাড়পত্র। যেমন করেই পারুক—দল সে রাখবেই। আর ভালো ভালো মেয়ে এনে দলের গৌরব বাড়াবে। তার জন্যে প্রাণ যদি পণ করতে হয় তাও করবে।

হাঁটতে হাঁটতে কানাই ধর লেনে এসে হাজির হল পরেশ। এখানে থাকে গোবিন্দ তালুকদার। দলের তবলচী। পরেশের অনেক দিনের পরিচিত মানুষ। গান বাজনার লাইনে বহুদিন ধরে আছে। একটি পুরোন দোতলা বাড়ির একতলায় সামনের দিকের ঘরগুলিতে দোকানপাট। মনিহারি দোকান, ফটো বাঁধাবার দোকান, একটা লণ্ড্রি। মাঝখান দিয়ে সরু এক ফালি পথ। সেই পথে এগিয়ে গিয়ে দুখানা ঘর ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকের তৃতীয় ঘরখানিতে গোবিন্দ থাকে। ভিতরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে তবলার বোলের শব্দে বোঝা গেল মালিক ঘরেই আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিতালটা শেষ না হল, পরেশ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। কড়া নাড়ল না। তাহলে গোবিন্দের মেজাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

আর ওর মেজাজ একবার বিগড়ালে আর কথা নেই। একেবারে প্রলয়কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে গোবিন্দ। মুখ খারাপ করে, হাতের কাছে যাকে পায় তাকেই দু-একটি চড়-চাপড় বসিয়ে দেয়। ঘরের জিনিস-পত্র ভেঙে তছনচ করে। মাথায় এখনো বেশ ছিট আছে গোবিন্দের।

তবলার শব্দ বন্ধ হতে পরেশ দরজায় টোকা দিয়ে ডাকল, 'গোবিন্দ।'

ভিতর থেকে সাড়া এল, 'কে ? পরেশ ? এসো এসো।'

দরজা খুলে গোবিন্দ তাকে ভিতরে ডেকে নিল।

ঘরের মেঝেয় একটা ছেঁড়া অপরিষ্কার মাদুর পাতা। তার ওপর জোড়া দুই বাঁয়া তবলা। এক কোণে একটা তানপুরা, পুরোনো হারমনিয়ম।

একুশ বাইশ বছরের একটি সুদর্শন ছেলে বাঁয়া তবলা কোলের কাছে নিয়ে বসে ছিল। পরেশ তাকে চেনে। তার নাম মানিক। গোবিন্দের ছাত্র। পরেশকে দেখে সে সবিনয়ে উঠে দাঁড়াল।

পরেশ বলল, 'বোসো, বোসো।'

গোবিন্দ বলল, 'না ওর আর এখন বসে দরকার নেই। মানিক ওর কাজে যাক। ওর আজকের তালিম শেষ হয়েছে।'

মানিক বলল, 'কি রকম দেখলেন ? আমার হবে তো গোবিন্দদা ?'

গোবিন্দ অভয় দিয়ে বলল, 'হবে হবে। লেগে থাকলেই হবে। তুই কিচ্ছু ভাবিসনে। শুধু কাজ করে যা।'

মানিক হেসে বলল, 'আপনাদের আশীর্বাদই তো সম্বল গোবিন্দদা।'

মানিক গোবিন্দের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, আর গুরুর বন্ধু বলে পরেশকে প্রণাম করে গেল।

ছেলেই হোক মেয়েই হোক, কেউ যখন পা ছুঁয়ে প্রণাম করে

তখন পরেশের গাটা মাঝে মাঝে শির শির করে উঠে—আর মনটা ছম ছম করে। মনে হয় সত্যিই তার ভালো হওয়া উচিত ছিল, মানুষের মত মানুষ হওয়া উচিত ছিল, কম বয়সীদের প্রণামের উপযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই হল না পরেশের। কোন ভালো কাজ করল না, কোন ভাল কিছু শিখল না। গান বাজনার লাইনে থেকেও কোন একটা জিনিস আয়ত্ত করতে পারল না। সে শুধু ম্যানেজারি করল, মানে দালালি করে গেল। একজনের জিনিস আর একজনের কাছে বিক্রি করে দিয়ে দু-পয়সা কমিশন পেয়েই সে সন্তুষ্ট রইল আজীবন। নিজের মূলধন বাড়াবার দিকে কোন দিনই চেষ্টা করল না। কেউ এসে প্রণাম করলে মাঝে মাঝে এই সব কথা মনে হয় পরেশের। শুধু ক্ষোভ নয়, আফশোস নয়, এই সব আচমকা প্রণাম মাঝে মাঝে তাকে চমকও দিয়ে যায়। মনে হয় এখনো বুঝি আশা আছে। এখনো চেষ্টা করলে নিজেকে খানিকটা তুলে নিতে পারবে, মরবার আগে অন্তত দু একটা ছেলেমেয়ের দু' একবারের প্রণামের যোগ্য হবে। হঠাৎ কেউ এসে প্রণাম করলে মাঝে মাঝে মনের এই ধরনের এক অদ্ভুত অবস্থা হয়ে যায় পরেশের। এক এক সময় সে এমনও ভাবে—গোবিন্দের যেমন ভক্ত আছে ছাত্র আছে পরেশেরও যদি তেমন দু একজন থাকত আর তারা পরেশকে রোজ এসে প্রণাম করত তাহলে বোধহয়, আর কিছু না হোক, চক্ষুলজ্জায় পড়ে পরেশ নিজের চেষ্টায় মানুষ হিসাবে দু এক ধাপ ওপরে উঠত। কিন্তু তার ছাত্র হবে কে ? তার তেমন কোন গুণ নেই, বরং দোষে আগাগোড়া ভরতি।

গোবিন্দ বলল, 'কি খবর ম্যানেজার আজ, যে একেবারে সকালেই বেরিয়ে পড়েছ ?'

পরেশের চেয়ে গোবিন্দ বেশ খানিকটা মাথায় লম্বা। পরেশ পাঁচ ফুটের ওপর ইঞ্চি দুয়েকের বেশি হবে না। গোবিন্দ তারও

ওপর ছ' সাত ইঞ্চি বেশি। রোগাটে চেহারা বলে আরো লম্বা মনে হয়। আর মোটা সোটা বলে পরেশকে দেখায় বেঁটে। কিন্তু বেঁটে হলেও নিগুর্ণ হলেও প্রতাপ পরেশেরই বেশি। সে দলের ম্যানেজার আর গোবিন্দ তার সহকারী তবলচী মাত্র। গোবিন্দও সুপুরুষ নয়, মনে হয় যেন বাজপোড়া এক মরা তালগাছ। রুক্ষ উস্কোখুস্কো চেহারা, লক্ষ্মীশ্রী কোথাও নেই। বিয়ে থা করেনি গোবিন্দ। শোনা যায় প্রথম বয়সে একটি মেয়েকে সে পছন্দ করেছিল, ভালোবেসেছিল। কিন্তু গান বাজনা নিয়ে আছে বলে সেই মেয়েটির বাপ মা গোবিন্দকে জামাই হিসাবে বরণ করতে চায় নি। স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন ঘরেই সে মেয়ের বিয়ে হয়েছে। তবু সে নাকি সুখী হয়নি। তার সেই সুখ না হওয়ার জন্যেই কি গোবিন্দের এমন শ্রীহারা চেহারা? গোবিন্দ অবশ্য তা স্বীকার করে না। বিয়ে না করার জন্যে অন্য অজুহাত দেখায়। হেসে বলে, আমাদের বিয়ে করা সাজে না ভাই। আমাদের রোজগারের স্থিরতা নেই। চালচলন, শোয়া বসা, খানাপিনা কোনটাই গৃহস্থ ঘরের যোগ্য নয়। আমার পক্ষে একটা মেয়েকে ঘরে আনা মানে—চিরকালের জন্য একটা জীবনকে নষ্ট করে দেওয়া। তার কি দরকার পরেশ।

নষ্ট করবার মত, নিজের খেয়ালখুশি মেটাবার মত নিজের জীবনটাই তো আছে। আনাচার অত্যাচার তার ওপর দিয়েই যাক। কি দরকার তার সঙ্গে আর একটা জীবন জড়িয়ে। শুধু একটা কেন, সেই সঙ্গে আরো গোটাকত কচি জীবন হয় তো পুড়ে যাবে। একটা পচা আপেলের সঙ্গে রেখে আরো পাঁচটা ভালো আপেলকে পচিয়ে দেওয়ার কি দরকার। তার চেয়ে পচা আঙুর, পচা আপেল হওয়ার সুখ একাই ভোগ করি।

কিছুতে ধরা দেয়না গোবিন্দ! এমনি হেঁয়ালী রেখে কথা বলে। এতকাল একসঙ্গে আছে পরেশ, কিন্তু ওর দুঃখের কারণটা

কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। ও নিজে মন খুলে কিছু বলে না বলে লোকে নানারকম গল্প ওকে নিয়ে তৈরী করেছে। কেউ বলে ও ছিল কিন্নরকণ্ঠ। ভালো ওস্তাদের কাছে মার্গসঙ্গীত শিখেছিল। গায়ক হিসাবে নামও করেছিল। কিন্তু গোবিন্দের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ওকে ভুলিয়ে এক বাঈজীর কাছে নিয়ে যায়। সেই বাঈজী ওকে আদর করে কি সব খাওয়ায়। তাতে কিছুদিনের মত মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল গোবিন্দর। মাথাটা পরে অনেকখানি ভালো হয়েছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা আর ফিরে আসেনি। ভাঙা ভাঙা গলা। সে গলায় গান গাওয়া যায় না। তাই যন্ত্র হাতে নিয়েছে গোবিন্দ। তার-যন্ত্র তার হাতে বিশেষ খুলল না বলে তবলা বাজায়। ওই স্থূল বাদ্যযন্ত্রটির ভিতর থেকে গোবিন্দ মাঝে মাঝে এমন মিঠে বোল বার করে আনে যে শুনে অবাক হয়ে যেতে হয়। কিন্তু তবলচী হিসাবে পরিচিত হতে গোবিন্দের ইচ্ছা নেই। কোন আসরে কি বৈঠকে সে যায় না। নিজের গুণ নিয়ে নিজের মন নিয়ে সে লুকিয়ে থাকে। পরেশ পীড়াপীড়ি করলে তার সঙ্গে যায়, নিঃস্বার্থভাবে দলের জন্যে খাটে। নিতান্ত দরকার না হলে পরেশের কাছ থেকে কিছু নেয় না। পরেশ এ নিয়ে কিছু বললে গোবিন্দ হেসে জবাব দেয়, 'কত লাখ পঞ্চাশ যেন তোমার দলের আয় যে তুমি বাঁটোয়ারা করতে এসেছ। তুমি বউ ছেলে নিয়ে ঘরসংসার করছ। আমার একটা পেট। তার জন্যে তো বেশি চিন্তা নেই। তা ভরাতে এমন কিছু বেগ পেতে হয় না।'

পরেশ গোবিন্দের এই ব্যবহারে, এ ধরনের কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। অবাক হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকায়। এত নির্লোভ, এত উদাসীন মানুষ হয় কি করে—পরেশ যেন ভেবে পায় না। কোন ধাতুতে গড়া এই মানুষটি। পরেশের মত কি শুধু রক্তমাংসেই তৈরী, না আরো অন্য কিছু আছে?

পরেশ মাঝে মাঝে বলে, 'গোবিন্দ, তুমি আমার চেয়ে শুধু মাথাতেই আধ হাত খানেক উঁচু নও—সব ব্যাপারেই উঁচু, সব ব্যাপারেই বড়। এমন দিল তুমি কোত্থেকে পেলে বল তো?'

গোবিন্দ লজ্জিত হয়ে বলে, 'কী যে বল। দিলের কী এমন পরিচয় পেয়েছ যে ও কথা বলছ ?'

আজ পরেশের একটু চিন্তিত ভাব দেখে গোবিন্দ নিজেই আলাপ জুড়ে দিল, 'কি হে ম্যানেজার, কি হয়েছে তোমার ? এসে অবধি যে মুখে সরা চাপা দিয়ে রইলে ?'

পরেশ বলল, 'জানো গোবিন্দ, মায়া পালিয়েছে। কোন এক বাবুর সঙ্গে গিয়ে ঘর সংসার করছে। সে আর এ লাইনে আসবে না। অন্তত আমাদের দলে থাকবে না। কি উপায় করি বলতো। এদিকে মহাপাত্র চিঠি লিখেছে, ওখানে শুরু হয়ে গেছে মরশুম। আমরা দলবল নিয়ে দু-চার দিনের মধ্যে যদি সেখানে গিয়ে না পড়তে পারি সব মাটি হবে।'

এ কথা শুনে গোবিন্দও চিন্তিত হয়ে পড়ল। মাদুরের ওপর বসে গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'তাইতো ম্যানেজার, মহা মুসকিলেই ফেললে দেখছি। মায়াই যে দলের সবচেয়ে বড় আশা ভরসা ছিল। তোমাকে এত করে বললাম—সারা বছর দলটাকে চালু রাখবার ব্যবস্থা কর। তাতে দলের কাজও ভালো হয়। দেশের মধ্যে নাম যশও বাড়ে। সারা বছর ভরে দেখা সাক্ষাৎ যোগাযোগ আর কাজ-কর্মের মধ্যে থাকলে মেয়েগুলিও এভাবে পালাতে পারে না।'

পরেশ বলল, 'আমারও তো তাই ইচ্ছা ছিল গোবিন্দ। কিন্তু বছর ভরে মাইনে দিয়ে একটা দলকে পোষা কি সোজা কথা। নিজেরই চলেনা, তা আবার ওদের খরচ জোগাব। আর এই শহরে কি আশে-পাশে আমাদের কেই বা বায়না করবে, কেই বা অত টাকা দেবে।'

গোবিন্দ বলল, 'সে কথা ঠিক বলেছ। সমস্যায় পড়া গেল দেখছি।'

অন্তত একটি দুটি মেয়ে যদি খুব ভালো না হয়, তা হলে দলই কাণা হয়ে যাবে। যে সব মেয়ে এর আগে দলে কাজ করেছে কিংবা যাদের কাজ করবার সম্ভাবনা আছে তাদের মধ্যে গোবিন্দ কারো নাম করল, পরেশ কারো নাম করল। তাদের কারো খোঁজ পরেশ রাখে, কারো বা গোবিন্দ। খোঁজ-খবর বিনিময়ের পর দেখা গেল তাদের কাউকেই পাওয়া দুষ্কর। কেউ সিনেমায় সুযোগ পেয়েছে কেউ বা থিয়েটারে, কেউবা অন্য কিছু না পেয়ে নিজের রূপ যৌবনের সম্বলকেই বড় করে তুলেছে। সামান্য টাকায়, যৎসামান্যের প্রলোভনে তাদের কেউ কয়েক মাসের জন্যেও কলকাতার বাইরে যেতে চায় না। যাদের টেনে হিঁচড়ে ধরে নেওয়া যায় তাদের নিয়ে দলের কোন লাভ নেই।

গোটা কয়েক বিড়ি পোড়াবার পর হঠাৎ গোবিন্দ বলল, 'একটা পথ আছে। আশ্চর্য, কথাটা এতক্ষণ মাথায় আসেনি।'

পরেশ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার ?'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গোবিন্দের উৎসাহ যেন নিভে গেল, তবে নিজের মনেই বলল, 'তবে মালার মা কি রাজী হবে ?'

পরেশ বলল, 'মালা ? ও তোমার সেই ছাত্রী ? তাকে পেলে তো কোন কথাই নেই। রূপে গুণে নাচতে গাইতে সব বিষয়েই সে ভালো। অমন মেয়ে আমাদের দলে আর আসেনি। তাকে পেলে তো কোন ভাবনাই থাকে না। তাকে পেলে মাথায় ক'রে নাচতে নাচতে নিয়ে চলে যাই। তাকে যদি বলে কয়ে নিয়ে আসতে পার, আমি তোমার চিরকালের গোলাম হয়ে থাকব।'

গোবিন্দ হেসে বলল, 'তা তো থাকবে, কিন্তু ওর মা কি রাজী

হবে? মেয়ে নিজেই কি রাজী হবে? মেয়ের রূপ গুণ অবশ্য আছে, কিন্তু দেমাকখানাও তেমনি।'

পরেশ বলল, 'তা থাক। কমলের সঙ্গে কাঁটা থাকে গোবিন্দ। অমন দেমাক-ওয়ালীকে আমি অনেক দেখেছি।'

গোবিন্দ বলল, 'ছিঃ। মালা আমার ছাত্রী। মেয়ের মত। ওর মা এখন পর্যন্ত ওকে খারাপ পথে যেতে দেয়নি। কোন থিয়েটার-সিনেমাতেও নামতে দেয়নি। তবে আমাকে ওরা খুব মানে-গনে। আমার কথা না শুনে কিচ্ছু করে না। আমি যদি বলি—।'

পরেশ গোবিন্দের দুখানা হাত জড়িয়ে ধরল, 'তোমাকে বলতেই হবে গোবিন্দ। যেমন করে পার, ওই মেয়েটিকে দলে আনতেই হবে। নইলে দল নিয়ে এবার আর আমি বেরোতে পারব না। দল তো একা আমার নয় গোবিন্দ, দল তো তোমারও। তুমি তার মান রাখ।'

গোবিন্দ বলল, 'কিন্তু ওদের যে বড় খুঁৎখুঁতি। মালার মা অবশ্য ওই পাত থেকেই এসেছে। সেও ধোয়া তুলসী গঙ্গাজল নয়। কিন্তু আজকাল নাকি সে সব ছেড়ে দিয়েছে। আর মেয়েটাকে সৎপথে রাখতে চায়।'

পরেশ বলল, 'আমাদের পথটা যে অসৎ, সে কথা তোমাকে কে বলল।'

গোবিন্দ হাসল, 'না, আমরা খুবই সৎসঙ্গের পথিক। কিন্তু মেয়েটাকে বিয়ে থা দিয়ে গেরস্থ করে, সুখী করে তাই ওর মার ইচ্ছা। শেষে যদি কিছু একটা হয়, মালার মা পদ্মমণির কাছে আমি কিন্তু মুখ দেখাতে পারব না। পদ্ম আমাকে দাদা বলে ডাকে। মা মেয়ে দুজনই আমাকে গুরুর মত ভক্তি করে।'

পরেশ বলল, 'তুমি তাহলে গুরুর কাজও কর, বন্ধুর কাজও কর। আমাকে বাঁচাও।'

গোবিন্দ বলল, 'তুমি তা হলে কথা দিচ্ছ? মেয়েটার যাতে মান সম্মানের হানি হয়, তা তুমি কিছুতেই হতে দেবে না ?'

পরেশ বলল, 'বেশ তাই। কোন খারাপ কিছু হলে তুমিই তো গ্যারান্টি রইলে।'

গোবিন্দ বলল, 'শুধু আমি না, আমাদের বন্ধুত্ব আর তোমার প্রাণকেও গ্যারান্টি রাখতে হবে। জানো তো আমাকে ?'

পরেশ বলল, 'জানি ভাই জানি। সব জেনেই এ কথা বলছি। তুমি মালাকে আনবার ব্যবস্থা কর। কেউ তার হাতপা তো ভালো, 'কেশ স্পর্শ'ও করতে পারবে না—তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি।'

গোবিন্দ বলল, 'আচ্ছা আমি চেষ্টা করে দেখি। কি হয় না হয়—সন্ধ্যার পর গিয়ে তোমাকে জানিয়ে আসব। তখন বাড়িতে থাকবে তো ?'

পরেশ বলল, 'তুমি যদি যাও তাহলে নিশ্চয়ই থাকব।'

বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরেশ বাইরে চলে এল। মির্জাপুর স্ট্রীটে পড়ে কলুটোলার দিকে এগোতে এগোতে নিজের মনেই বলল, 'ঢং দেখলে গায়ে জ্বর আসে। কী সব সতী সাধ্বীরা এসেছেন। গানের দলে এসে পান থেকে চূণ খসলেই তাদের জাত যাবে। আর গোবিন্দটাও হয়েছে ন্যাকা। সব জেনে শুনেও ওদের কথা বিশ্বাস করবে। এমন ভাব করবে, যেন ওসব মানা না মানার সত্যিই কোন মানে আছে।

এসব হল দর বাড়াবার ছল। পরেশ কি আর তা বোঝে না? খুবই বোঝে। তবে এখন বুঝেও না বোঝার ভান করে নরম হয়ে পায়ের কাদা হয়ে থাকতে হবে। তারপর কাজ হাঁসিল হয়ে গেলে উপযুক্ত সময় এলে পায়ের কাদাই হবে মাথার ইঁটপাটকেল।'

বাড়িতে ফেরবার আগে পরেশ রামবাগানের ঘাঁটিটাও ঘুরে গেল। ওখানে থাকে চাঁপা, মল্লিকা আর সুবাসিনী, তারা কেউ মূল

নায়িকা নয়, সখী সহচরীর দল। দু'তিন বছর ধরেই তারা পরেশের সঙ্গে কাজ করছে। একটু তোয়াজ করে পিঠে হাত বুলিয়ে কথা বলতেই ওরা রাজী হয়ে গেল। বাইরে গেলে ওদেরই সব চেয়ে লাভ বেশি। অপ্সরী কিন্নরী বলে নিজেদের বেশ চালাতেও পারে, রোজগারও করে দু হাতে। তারা রাজী হবেনা কেন?

বাসায় ফিরে পরেশ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'মনিঅর্ডার পিওন এসেছিল?'

সুধা ঘাড় নেড়ে বলল—'না। এত সকালে কবে মনি-অডার পিওন এসেছে। তোমার গরজ বেশি বলেই তো দুনিয়ার নিয়ম-কানুন সব উল্‌টে যাবে না?'

পরেশ বলল, 'উল্‌টে যাওয়ার কথা তো বলিনি। টাকা এলে বিটের পিওন এক আধ ঘণ্টা আগেও এদিকে আসতে পারে। সেটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সকাল থেকে কী তোমার হয়েছে বলতো? রস নেই কস নেই—কেবল কট কট করছ তো করছই?'

সুধা বলল, 'হুঁ, আমি একাই কট কট করি। আর তুমি দিনরাত মুখে মধু মেখে বসে আছ। তুমিই কম জ্বালাচ্ছ কিনা? শান্তি কি রাখতে দিয়েছ মনের? মিষ্টি কথা কোত্থেকে বেরোবে শুনি?'

পরেশ আর কথা বাড়াল না। স্নান করে খেয়েদেয়ে নিল। ছেলেমেয়েগুলির খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল, সুধা তাদের ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রেখেছে। তাদের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল পরেশ। বিড়ি টানতে টানতে আড়-চোখে দেখতে লাগল সুধাকে আর তার গৃহস্থালীকে। সত্যিই ঘরের বউ হয়েছে সুধা। রান্নাবান্না করে ছেলেমেয়ে স্বামীকে খাওয়ায়। তারপরেও তার কাজের শেষ হয়না। ধোয়া-মোছা-নিকোনো চলতেই থাকে।

পরেশ মাঝে মাঝে তাগিদ দেয় 'কত আর বেলা করবে ? খেয়ে নাও, খেয়ে নাও।'

সুধার ঘরকন্না দেখে পরেশের নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে। তার মাও এমনি করত। স্বামী পুত্র ঘর-সংসারকে কি ভালোই না বাসত। রাগ করত, গালাগাল করত, চেঁচিয়ে, গলা ছেড়ে চীৎকার করে বলত, 'আর পারিনা। আমার হাড়মাস এরা সব চিবিয়ে খেল।' কিন্তু তারপর সময়ে সবই করত, স্বামী আর সন্তানের যত্নে পারতপক্ষে অবহেলা করত না।

সুধাও তেমনি হয়েছে। অথচ পাঁচবছর আগেও সম্পূর্ণ ভিন্ন-রকমের জীবন ছিল সুধার। মানদা মাসীর বোনঝিয়ের মতই তারও বেলা দশটার আগে ঘুম ভাঙত না। পরকে রেঁধে বেড়ে খাওয়ানো তো দূরের কথা, নিজের খাবারটাও হোটেল থেকে আনিয়ে নিত। নিজের শরীর ছাড়া আর কোন কিছুর যত্ন করতে জানত না, করবার দরকার বোধ করতনা। সেই সুধা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। নিজে সব চেয়ে পরে খায়, নিজের দেহের যত্ন সব চেয়ে পরে করে। অভাবের সংসারে খেটে খেটে ওর চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। এখন আর ইচ্ছা করলেও সেই আগের পেশায় ফিরে যাওয়ার জো নেই সুধার। এখন আর কেউ তার দিকে তাকাবেনা। এখন তাকাবে শুধু স্বামী আর ছেলেমেয়েরা। ভিন্ন ভিন্ন চোখে।

সুধাকে বিয়ে করে তাকে দিয়ে রান্নাবান্না করে খাচ্ছে শুনে নিমাই একদিন পরেশকে বলেছিল, 'অমন কাজও করিসনে পরেশ। রাঁধুনী রেখে দে, রাঁধুনী রেখে দে।'

পরেশ বলেছিল, 'কেন ?'

নিমাই বলেছিল, 'তা না করলে ওই বউ একদিন তোকেই রাঁধুনী করবে—না হয় রান্নার ভয়ে ঘর ছেড়ে পালাবে।'

কিন্তু পাঁচবছর তো গেছে। এর মধ্যে পালায়নি সুধা। এ

ধরনের মেয়েদের যারা বিয়ে করে, তারা পত্নীকে উপপত্নীর মতই আদর যত্নে রাখে। কিন্তু সুধাকে তেমন স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখতে পারেনি পরেশ। সুধা নিজেও তা চায়নি। এতদিন বসে বসে খেয়ে এখন নিজের হাতে করে কর্মে আর খাওয়ানোতেই সুধা যেন বেশি সুখ পেয়েছে, নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। মানুষেই ইচ্ছা করলে কতবার তার অভ্যাস, চালচলন, স্বভাব বদলাতে পারে, এই একই জন্মে নতুন করে জন্মাতে পারে—চোখের ওপর সুধা তার প্রমাণ দিয়েছে।

স্ত্রীকে রান্নাঘরে নিঃশব্দে কাজ করে যেতে দেখে পরেশের মনটা, একটু যেন কোমল হল, মায়া হল ওর ওপর। স্ত্রীকে কাছে ডেকে বলল, 'সুধা শোন।'

কাছে এগিয়ে এল না সুধা। রান্নাঘর নিকোতে নিকোতেই মুখ তুলে সাড়া দিয়ে বলল, 'কি বলছ। অত মধুর ডাকে ডেকো না গো। মরে যাব। বাঁচব না।'

পরেশ হেসে বলল, 'ওসব সারা এখন থাক। খেয়ে নাও। বেলা একটা বাজল। মনি-অর্ডারের পিওন এই সময়েই তো আসে। এসে পড়লে ডেকে দিয়ো আমাকে।'

সুধা বলল, 'ডেকে দেব কেন, ফিরিয়ে দেব। আমি তো তোমার শত্তুর।'

পরেশ হাসতে লাগল, 'আরে নারে না। নারে না। তুই এখন সংসারে আমার একমাত্র মিতিন। গিন্নী-বান্নী সব।'

সুধা বলল, 'থাক থাক হয়েছে। তোমার দলের বায়না হয়ে গেছে, কত ফুর্তি তোমার মনে। এখন আর তোমাকে পায় কে। সারাটা সকাল আর দুপুর তো বাইরে বাইরেই কাটিয়ে এলে। নতুন নতুন সব সখিদের নিয়ে রংতামাসা করলে, তোমার কি।'

পরেশ বালিশ থেকে মাথাটা একটু তুলে নিয়ে বলল, 'সখি, না ঘোড়ার ডিম। ওদের দিকে তাকানো যায় নাকি। নিতান্তই

কাজের সম্পর্ক, তাই ডাক খোঁজ করতে হয়। কন্‌ট্রাকটররা যেমন মজুর কারিগর খাটায়, আমিও তেমনি। লোককে খাটাতে না পারলে আমার পয়সা কোত্থেকে আসবে, আর এই কাচ্চাবাচ্চা-গুলিকে কী খাইয়েই বা বাঁচিয়ে রাখব। অবুঝ হসনে সুধা। বুঝে কথা বল।'

সুধা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বুঝেছি গো বুঝেছি। তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর। আমি আর কিছুতেই বাধা দেবনা।'

পরেশের এবার ঘুম আসছে। সে পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'দোরের দিকে কান রেখো।'

৪

খাওয়া সেরে একটা পান মুখে দিয়ে সুধা তক্তপোষের দিকে তাকিয়ে দেখল—পরেশ আর ছেলেমেয়ে দুটি ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছে। সুধা মুহূর্তকাল সেদিকে তাকিয়ে রইল। সত্যি এতদিন কোথায় ছিল এরা? এদের তো আসবার কথা ছিল না। মাঝে মাঝে নিজেরই যেন ভেবে অবাক লাগে সুধার। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছে। জেগে উঠে দেখবে সে মানদামাসীব ছোট ভাড়াটে ঘরে একা একা পড়ে আছে। কি বড়জোর একটা অচেনা লোক এক পাশে মদের নেশায় বিভোর হয়ে ঘুমোচ্ছে। মেঝেয় দু' একটা খালি বোতল। এলোমেলো জিনিসপত্র। সারা রাত ঘরের মধ্যে ঝড় বয়ে যাওয়ার চিহ্ন।

এখন শান্তভাবে ভাঙের নেশায় ঘুমোলে কি হবে, পরেশের ও তখন মদ ছাড়া ঘুম পেত না। ঢক ঢক করে বোতল শেষ করে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানায় এসে তাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকতেই ভালোবাসত পরেশ। বলত 'যারা ভালোলোক তারা বলে এখানে আসা মানে আত্মহত্যা করা। আমি তাই রোজ একবার করে এসে আত্মহত্যা করি। নিজেকে নিজে খুন করি। কিন্তু পুলিসের হাতে ধরা পড়বার আগেই নিজেকে দিনের বেলায় ফের বাঁচিয়ে দিই। মরা মানুষ ফের নড়ে চড়ে ওঠে, হেঁটে চলে বেড়ায়। গোয়েন্দা পুলিস থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি রকম মজা তাই বলতো সুধা।'

সুধা পরেশের কথার ভঙ্গিতে হাসত, বলত, 'তোমাকে অমন মরতেই বা বলে কে, বাঁচতেই বা বলে কে ?'

পরেশ বলত, 'সব তুই বলিস সুধা, তুই ছাড়া আর কে বলবে। তুই চোখ দিয়ে যা বলিস, নিজের মুখে তাই আবার না করিস, কোন কথাই তো তোর মনের কথা নয়। তাই কিছু মনে রাখতে পারিস নে।'

সুধা বলল, 'মন প্রাণ যেন তোমাদেরই কত আছে। আচ্ছা, তুমি যে এসব জায়গায় আস, তোমার বউ কষ্ট পায় না ?'

পরেশ বলত—'পায় আবার না ? কষ্ট পাওয়াটাই তার স্বভাব। তার কষ্ট নেবে কে ? আমি তাকে ভাতও দিই কাপড়ও দিই, আদর করি সোহাগ করি, যখন তার কাছে থাকি তখন বার বার বলি, ওগো, তোমা বই কিছু জানি নে। কিন্তু সে কিছুতেই তা বিশ্বাস করে না। এটা বোঝেনা—যে বিশ্বাসে মিলয়ে কেষ্ট, আর অবিশ্বাসে মিলয়ে কষ্ট। বিশ্বাসেই সুখ, বিশ্বাসেই শান্তি। কিন্তু সে তা কিছুতেই মানতে চায় না।'

সুধা বুঝতে পারে মানুষটি নিষ্ঠুর, মানুষটি খুব সৎ নয়। কিন্তু সৎলোক বিবেচক লোক সুধাদের কাছে যাবে কেন ? চোর জোচ্চোর খুনী বদমাস, সমাজ সংসার পরিবার থেকে তাড়া খাওয়া হাজার কারণে, হাজার বার ঘা খাওয়া মানুষের হৃদয়-ব্যথা, মনের কথা জানবার জন্যেই তো সুধারা আছে। পরেশের মত মানুষ কি একজন ? তার কাছে যারা আসে, তারা সবাই ওই রকম। উনিশ আর বিশ। তাছাড়া সবাই এক।

তবে পরেশ মানুষটা ওরই মধ্যে একটু অন্যরকম। ওর বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে। কথাবার্তা চালাক-চতুরের মত। মনে হয় এত বড় একটা দুনিয়াকেও কেবল হেসে আর ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিতে পারে।

জিজ্ঞেস করে করে পরেশের বউয়ের গল্প শোনে সুধা।

বউয়ের নাম বীণাপাণি। মাগো, আজকাল আবার অমন পুরোন নাম থাকে নাকি ঘরের বউয়ের ?

পরেশ বলে, 'আমার কপালে সবই পুরোন। মানুষটাও একেবারে পুরোন আমলের। বউ তো নয়—যেন দিদিমা বুড়ি। যেমন শুচিবাইয়ে ভরা তেমনি ছিচকাঁদুনে। রাগ হলে আর কাণ্ড-জ্ঞান থাকে না।'

পরেশ বলে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে তার। বউ নাকি কথায় কথায় প্রায়ই বলে—তার বাপ মা না জেনে তাকে জলে ফেলে দিয়েছে। পরেশ জবাব দেয় 'আমি যদি জল হতাম, তোমার মনের আগুন সব নিবে যেত। আমি জল নয় বাতাস। তার ছোঁয়ায় তোমার আগুনের হলকা আরো বাড়ে, আরো ছড়ায়। আমার সঙ্গে ঝগড়া করা মানে বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা। আগুন আর বাতাস কোনদিন ঝগড়া করে না। তুমি কর। কারণ তুমি নিজেকেও চেন না, তোমার সোয়ামীকেও চেন না।'

কিন্তু এসব ঠাট্টা তামাসায় বীণার মন ভেজে না। সে আরো রাগ করে ঝগড়াঝাটি করে অশান্তি বাড়ায়। তারপর রাগ করে ঘরের জিনিসপত্র ছত্রছান করে ফেলে দিয়ে চলে যায় হরতুকি বাগানে বাপের বাড়িতে। পরেশ সেখানে বউয়ের মান ভাঙাতে গিয়ে মুখ পায় না। বীণার ছোট ভাইরা ঘুষি বাগিয়ে আসে। বুড়ো বাপ পায়ের ছেঁড়া চটি খুলে তেড়ে এসে বলল,—'দূর হ, দূর হ, জামাই না যম। দূর হ।'

পরেশ তাড়া খেয়ে হুপ হুপ করে চলে আসে বউবাজারে। যেখানে বাজার ভরা বউ। যে রাস্তায় প্রেম আর চাঁদ গড়াগড়ি যায়।

পরেশ অবশ্য হাসতে হাসতেই এসব কথা বলে। কিন্তু সুধার কেমন যেন মানুষটার জন্যে বড় দুঃখ হয়। সুধার মনে হয় এ লোকটার বুকেও ব্যথা আছে। লোকটা একেবারে অকারণে অমন

নিষ্ঠুর অ র শঠ হয়ে যায়নি। পরেশ যখন মাঝে মাঝে আসে, সুধা তাকে একটু বেশি খাতির যত্নই করে। মদ খেয়ে বমি করলে পরিষ্কার করে, জামাটামা নষ্ট করে ফেললে ছাড়িয়ে নেয়। পরেশের জন্যে বারবার বিছানার চাদর বদলাতে হয় তাকে।

সুধা শোনে পরেশের বউ রাগ করে মাসের পর মাস বাপের বাড়িতে পড়ে থাকে। ন'মাস ছ'মাস বাদে যদিবা ফের আসে, দু-তিন দিন যেতে না যেতেই ফের ঝগড়াঝাটি লেগে যায়। নিজেও টিঁকতে পারে না, পরকেও টিঁকতে দেয় না। তাই কোনবার পরেশই আগে পালায়, কোনবার বউই আগে পালিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়।

সুধা মনে মনে ভাবে, 'আহা, দুঃখ তো কারোই কম নয়।'

কিন্তু পরেশ যেন কোন দুঃখকেই আমল দিতে চায় না। ও যেন হেসেই সব উড়িয়ে দেবে, মদেই সব ভাসিয়ে দেবে।

তারপর একদিন পরেশ বলল, 'আমার একটা গান বাজনার দল আছে। আমি সেই দল নিয়ে মাঝে মাঝে দিগ্‌বিজয় করতে বেরোই। তুই আসবি আমার দলে? তুই তো গানও জানিস, আবার একটু একটু পা ছোঁড়াটোড়াও শিখেছিস '

সুধা লোককে টানবার জন্যে ওস্তাদ রেখে কিছুদিন ধরে নাচ-গান অভ্যাস করেছিল। তার জন্যে মাসীর কাছে তার কদর ছিল বেশি। বাবুরাও আদর যত্ন করত। হিংসায় জ্বলত অন্য মেয়েরা। তারা বলত, 'তোর নাচ মানে তো কোমর দুলানি, আর গান মানে তো বেসুরো গলায় সিনেমার গানগুলি আউড়ে যাওয়া।'

সুধা বলত, 'যাই হোক। এরজন্যেই তোরা হিংসেয় ফেটে মরিস, এর জন্যেই সারা কলকাতা শহর আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে। ওলো বিন্দি, আমার যা আছে তাই বা খায় কে? যা আছে তাই বা পায় কে?'

কিন্তু পরেশ যখন তাকে দলে যোগ দেওয়ার কথা বলল, একটু

লজ্জা পেয়ে গেল সুধা। বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে আসরে দাঁড়িয়ে দশজনের সামনে গাইবার কি নাচবার ক্ষমতা সুধার কি আছে? লোকে হাসবে যে।

পরেশ বলল, 'সেজন্যে ভাবিসনে। আমার হাতে এমন ওস্তাদ লোক আছে যে তোকে শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়ে ঠিক করে নিতে পারবে। তার চাঁটিতে বোবা তবলার বোল বেরোয়, বোবা মেয়ে গলা ছেড়ে গান করে, আর যে খোঁড়া সেও ময়ূরীর মত নাচে। যদি চাঁটি খেতে পারিস, গান-বাজনা তোকে আমরা শিখিয়ে নিতে পারব।'

একথা শুনে সুধার মন তখনই নেচে উঠল। সে যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। এই অন্ধকার গর্ত থেকে বেরিয়ে সে আলোর মুখ দেখবে, কত দেশবিদেশ, সমুদ্র আর পাহাড় পর্বত দেখবে। কত দেবদেবী, কত তীর্থস্থান সে দেখে আসতে পারবে।

পরেশ রাতের পর রাত তার কানে সেই মোহনমন্ত্র জপতে লাগল। কিন্তু বেশি জপবার আর দরকার ছিল না। সুধা দুএকবার শুনেই মুগ্ধ হয়ে গেছে। কত আর বয়স হবে তখন বছর উনিশেক। অবশ্য সংসারের হালচাল তার তের বছর বয়স থেকেই জানা। পুরুষরা কেমন মানুষ তা তার চিনতে বুঝতে আর বাকি নেই। কিন্তু পরেশের প্রস্তাব তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হল। দূরের হাতছানি তার চোখকে মুগ্ধ করল। প্রায় এক কথায় রাজী হয়ে গেল সুধা। মাইনেপত্র নিয়ে কোনরকম দরকষাকষি করল না। মাসী অবশ্য সহজে ছাড়তে চায়নি। সে পরেশের সঙ্গে দরদাম করতে লাগল। আগাম কমিশন হিসাবে কিছু টাকা আদায় করে নিল। কিন্তু সুধার যেন ওসব কিছু দরকার ছিলনা। সে যে ট্রেনে করে নানা জায়গায় ঘুরতে পারবে, নানা জিনিস দেখতে পারবে—তার চেয়ে বড় পাওয়া যেন আর নেই।

সুধা লক্ষ্য করল—তার উৎসাহ আর আগ্রহ দেখে পরেশও খুব

খুশি হয়েছে। সে বলল, 'তোকে আমি সব সুযোগ সুবিধা দেব। দলের সেরা মেয়ে হবি তুই।'

পরেশ সুধাকে নিয়ে তুলল তার দরমাহাটার বাসায়। তখন ওখানেই থাকত পরেশ। বউ বেশিরভাগ সময় রাগ করে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকে, আর সেই সুযোগে মেয়েদের নিয়ে রিহার্শেল দেয় পরেশ। অবশ্য বউয়ের সামনেও সে ওইসব মেয়ে নিয়ে হৈ হল্লা করতে পারত। পরেশের তো কোন লজ্জা সংকোচের বালাই নেই।

সেখানেই আলাপ হল গোবিন্দ তালুকদারের সঙ্গে। শুকনো কালো দড়ির মত পাকানো চেহারা। মাথার আধখানা জুড়ে টাক। প্রথমে দেখে সুধার তো মোটে ভক্তিই হয়নি। এমন লোক আবার কি শেখাবে। কিন্তু দু চারদিন তালিম নিয়েই সুধা বুঝতে পারল —গোবিন্দ যে সে লোক নয়। মানুষটি একেবারে গুণের খনি। শুধু তবলাই বাজায় না। গানের রাজ্যের অনেক সন্ধান জানে। সুধাদের মত মেয়ে তার পায়ের তলায় বসে বারো বছর গান শিখতে পারে। কিন্তু গোবিন্দের উৎসাহ থাকলে কি হবে, সুধাকে বেশি কিছু শেখানো যেন পরেশের ইচ্ছা নয়। শুধু দলের জন্য যেটুকু কাজে লাগবে সেইটুকু শিখতে পারলেই যথেষ্ট। পরেশ গোবিন্দকে প্রায়ই তাড়া লাগাত, 'হয়েছে হয়েছে। সুধা তুমি যেটুকু শিখেছ তাই ঢের। লোকে ওইটুকুই আগে হজম করুক দেখি। বেশি দেরি করবার সময় ত নেই। দলের বায়না হয়ে গেছে। এবার তল্পিতল্পা বেঁধে ফেল।'

গানকে যদিও ব্যবসা হিসাবেই নিয়েছে, তবু পরেশের বেশিরকম দোকানদারির ভাব সুধার যেন সব সময় ভালো লাগতনা। পরেশের তাগিদ সত্ত্বেও গোবিন্দ সঙ্গত করে চলত, সুধা গাইতে থাকত। শুধু সস্তা হালকা গানই গোবিন্দের কাছে সে শেখেনি। কিছু কিন্তু খেয়ালেরও চর্চা করেছে। যদিও দলের কাজে তা

লাগত না। কীর্তন, ভজন, খেমটা, গজলেরই চাহিদা ছিল বেশি। আর সুধারা তো সবসময় চাহিদা মেটাবার জন্মেই আছে।

সুধা প্রথম প্রথম গোবিন্দকে ওস্তাদজী বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলল, 'আমি কোন ওস্তাদের পায়ের নখেরও যোগ্য নই। তুমি আমাকে গোবিন্দদা বলে ডেকো।' সুধা বলেছিল, 'যদি শুধু দাদা বলি আপনি কি রাগ করবেন ?'

গোবিন্দ হেসে বলেছিল, 'রাগ করব কেন, বরং খুব খুশি হব। তোমাদের মধ্যে একজন বোন পাওয়া তো সহজ নয়।'

সুধা হেসে বলেছিল, 'দোষ নেবেন না, আপনাদের মধ্যে ভাইই কি আমরা সহজে পাই ?'

গোবিন্দের সঙ্গে ভাইবোনের ধর্ম-সম্পর্ক পাতিয়ে সেদিন বড় অদ্ভুত তৃপ্তি পেয়েছিল সুধা। তার জীবনে একজন দাদাকে পাওয়া সেই প্রথম। প্রথম প্রেমিককে পাওয়ার মত, প্রথম পুরুষের আদর পাওয়ার মত, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে একজন ভাইকে পাওয়া কম কথা নয়। বিশেষ করে সুধাদের জীবনে ভাইতো আসেনা, ভাইতো কেউ হতে চায় না। গৃহস্থ-ঘরের ঝি-বউদের পুরুষের সঙ্গে নানা সম্পর্ক। মুখে মুখে কত রকমের ডাক। কেউ বাবা, কেউ দাদা, কেউ ছোট ভাই, ভাইপো, বোনপো—আরো যে কত রকমের সম্পর্ক আছে তা জানে না সুধা। সে জানে শুধু দেহলোভী এক রকমের পুরুষকে। বাপের বয়সী যে আসে সেও প্রণয়ী, আবার ছোট ভাই কি ছেলের বয়সী যারা আসে তারাও তাই। সুধা লক্ষ্য করে দেখেছে—মাসী কি বেশি-বয়সী মেয়েদের কম বয়সীদের দিকেই লোভ বেশি। তাদের নিয়েই বেশি টানাটানি। ঘরের টাকা ব্যয় করেও পরের ছেলেদের তারা ধরে রাখতে চায়। ওই ভাবেই মা হবার সাধ তারা মিটায় কিনা কে জানে।

ভাই-বোন সম্পর্ক পাতিয়ে নিলেও পরেশ কিন্তু গোবিন্দকে

হিংসা করতে ছাড়েনি। ঠাট্টা করেছে, নানারকম চোখা চোখা কথা বলে খোঁচা দিয়েছে। পরেশের কাণ্ড দেখে লজ্জায় মরে গেছে সুধা। এই কত গভীর বন্ধুত্ব। একটু বাদেই বিশ্রী বিশ্রী কী সব কথা। একটা মানুষই যেন গোটা একটা চিড়িয়াখানা। ভিতরে জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই।

পরেশ হিংসা করে বলেছে—'তুই আমার চেয়ে ওই গোবিন্দ-টাকে বেশি ভালোবাসিস।'

সুধা বলেছে, 'ছি ছি ছি—কী যে বল, দুই ভালোবাসা কি এক?'

পরেশ বলেছে, 'এক রকম ছাড়া তোরা আবার দুতিন রকমের ভালোবাসা জানিস না কি?'

সুধা জবাব দিয়েছিল—'আগে জানতুম না। তোমাদের দলে এসে শিখলুম। গোবিন্দদাকে আমি খুব ভক্তি করি।'

তার উত্তরে পরেশ বলেছিল, 'খুব সাবধান। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।'

সুধা মনে মনে হেসেছিল। পরেশ নিজে যে চুরি করে বউকে ঠকায় তাতে কোন দোষ নেই। আর চুরি জোচ্চুরি যার পেশা তার জন্যেই যে লাইসেন্স নিয়েছে—তাকেই পরেশ বার বার হাতকড়ি পরাতে চায়।

পরেশের বাইরের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত রিহার্শেল হত। সুধা ছাড়াও আরো দুটি মেয়ে ছিল। তারাদাসী আর সিন্ধুবালা। সেকেলে নাম বলে পরেশ ওদের নাম দুটো বদলে রাখল ইরা আর বেলা।

সুধা বলল, 'আমার নাম বদলালে না?'

পরেশ বলল, 'দরকার নেই। তোর নাম এমনিতেই বেশ মিষ্টি।'

একথা শুনে ইরা আর বেলা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল, আর পরেশের অসাক্ষাতে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ইরা বলল, 'কিসের মত মিষ্টি লো সুধা। মধুর মত, না গুঁড়ের মত ?'

সুধা বলল, 'কি জানি ভাই। গোবিন্দদা বলেছেন, সুধা কথাটার মানেও নাকি মিষ্টি। তা নাকি দেবতারা খায়।'

বেলা হিহি করে হেসে উঠেছিল—'খাবেই তো। তোর রূপ আছে, গুণ আছে, বয়স আছে, তোকে তো দেবতারাই খাবে। আমরা তো আর তেমন নই। আমাদের খেতে আসে যত রাক্ষস ভূত-প্রেত আর অপদেবতারা। তাও মধুর মত খায়না, কুইনাইনের মত গেলে।'

রিহার্শেল শেষ হলে ওরা চলে যেত। কিন্তু সুধাকে পরেশ সহজে ছেড়ে দিতনা। বলত, 'এসো, আমার ভিতরের ঘরখানা একটু দেখে যাও, গুছিয়ে দিয়ে যাও।'

কিন্তু ভিতরে যেতে কেন যেন সুধার বড় গা কাঁপত। যদিও পরেশের বউ বীণা এখন বাড়িতে নেই, রাগ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে রয়েছে, তবু তার সেই ছেড়ে-যাওয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে পরেশের আদর নিতে নিতে সুধার বুকের ভিতরটা বড় কাঁপতে থাকত।

দেয়ালে টাঙানো পরেশের বউয়েরই একখানা আয়না। তার ফেলে-যাওয়া চিরুনি, সিঁদুর কৌটো, চুলের কাঁটা। হয়তো আলনায় ঝুলানো দুএকখানা পুরোন শাড়ি। তক্তপোষের ওপর পাতা বিছানায় চাদরে ঢাকা পাশাপাশি দুজোড়া বালিশ। দেখে দেখে সারা গা শিউরে উঠত সুধার। পরেশকে বাধা দিয়ে বলত, 'নানা এখানে না, এখানে না। এটা তোমার বউয়ের ঘর।'

পরেশ হেসে উঠত, 'নাম লেখা আছে নাকি ঘরে ? আংটি তুমি কার ? যার হাতে আছি। ঘর তুমি কার ? যে বাস করে। মেয়ে তুমি কার ? যে আদর করে। মন তুমি কার ? যার

ছোঁয়ায় নাচি। সে তো আমাকে ঘেন্না করে ছেড়েই চলে গেছে সুধা। সে তো আর আমার মুখ দেখেনা। তবে তোর অত লজ্জা কিসের।'

সুধা বলত, 'লজ্জা নয় গো—ভয়। ভয়ে আমার বুক কাঁপে।'

পরেশ বলত, 'ভয়ই বা কিসের—সে তো আর মরে ভূত হয়নি, যে বাতাসে ভেসে চলে আসবে। কি জানালা দিয়ে মুখ বাড়াবে। অত যদি ভয়ই পেয়ে থাকিস আমার বুকের মধ্যে আয়, বুকে মুখ গুজে থাক, সেখানে কোন ভয় নেই।'

যে দেবতারা সুধা খান তাঁরা হয়তো ষোলআনাই দেবতা। কিন্তু যে মানুষগুলি সুধাদের মত মেয়েমানুষের কাছে আসে তারা বোধহয় কোনটাই পুরোপুরি নয়। না মানুষ, না দেবতা, না রাক্ষস, না পিশাচ। এরা যাই হোক—এদের নিয়েই সুধাদের সমাজ সংসার, জীবনের সাধ আহ্লাদ, হাসি কান্না উৎসব আনন্দ। এদের বাদ দিয়েও সুধারা চলতে পারেনা, এদের হাত থেকেও সুধাদের রেহাই নেই।

দল নিয়ে সেবারও প্রথমেই উড়িষ্যায় গিয়েছিল পরেশ। বাসা বেঁধেছিল ভুবনেশ্বর শহরের একপ্রান্তে। [illegible] তিনেক ঘর। ভাড়া কলকাতার তুলনায় খুবই সস্তা। জিনিসপত্রের দামও তাই। নানা রকমের রূপার গয়না, কত রঙ বেরঙের নক্সী পেড়ে শাড়ি। সুধার ইচ্ছা করত সব কিনে বাক্স বোঝাই করে।

ইরা আর বেলা হেসে বলত, 'অত হ্যাংলা কেনরে তুই। তোর ভাবনা কি। দলে ঢুকতে না ঢুকতেই রাণী হয়ে বসেছিস। এদেশেও রাজারাজড়ার অভাব নেই। তারা তোকে সিংহাসনের পাশে বসিয়ে রাখবে। কিছুতেই আর কলকাতায় ফিরে যেতে দেবেনা।'

শহরের একপ্রান্তে বাসা বাঁধলেও সুধারা শুধু শহরের মধ্যেই গান গাইত তা নয়। পরেশ দলবল নিয়ে অনেক দূরে দূরে

গাঁয়ের ভিতরও চলে যেত। সে সব গ্রামের খোলা-গা খাটো-ধুতি-পরা লোকজন দেখে সুধা অবাক হয়ে ভাবত—এরা আবার গান শুনবে কি, এরা আবার পয়সা পাবে কোথায়!

কিন্তু এইসব হাজার হাজার দীন দরিদ্রের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে দু'একজন বড়লোক বেরিয়ে পড়ত। তাদের কারো পরণে দামী ধুতি পাঞ্জাবী—আবার কেউ বা খোদ সাহেব, মাথায় টুপি, মুখে পাইপ। কেউ বা বড় বড় সুন্দর সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা মোটর গাড়িতে। তাদের দেখে মনে হতনা দেশটা এত গরীব, এখানে বেশিরভাগ লোক খেতে পায়না। এসব রাজা-রাজড়া জমিদার জোতদার ব্যবসাদারদের দেখে এদেশে যে কোন দুঃখ কষ্ট আছে তা মনে হত না সুধার। বিশেষ করে রাত্রে গানের আসরে, আলোয়, ফুলের মালায়, বাজনার রোলে, গানের সুরে দেশটাকে মনে হত পরীর দেশ বলে। মাঝে মাঝে পুরস্কার টুরস্কারও মিলত।

অবশ্য পরেশের মাইনের চেয়ে উপরি-রোজগারটাই বেশি হত ইরা আর বেলার। আসর শেষ হলে দু'একজন সমঝদার শ্রোতার সঙ্গে তারা বেড়াতে বেরোত। কেউ নিয়ে যেত বাগান বাড়িতে, কেউ বা হোটেল টোটেলে। ফিরে আসত মুঠি মুঠি টাকা নিয়ে। যেদিন গান থাকত না, ইরা আর বেলা সেদিন বেড়িয়েই বেড়াত। আসরের কোন ক্ষতি না হলে পরেশ এ সব বিষয়ে কোন আপত্তি করতনা। ওদের রোজগারের অংশও চাইত না।

একদিন ইরা বলল, 'কি ব্যাপার, তুই যে এসে অবধি ঘরের বউ হয়ে রয়েছিস। বেরোচ্ছিস না কেন? লোকজন এলে ঘরে নিচ্ছিস না কেন?'

সুধা বলল, 'না ভাই আমার কেমন ভয় করে। বিদেশে বিভুঁইয়ে শেষে কি হতে কি হবে।'

একথা শুনে ইরা আর বেলা হেসে গড়িয়ে পড়ত। 'শোন শোন, আমাদের কনে বউটির কথা শোন। বিদেশী পুরুষকে না কি ওর ভয় করে।'

বেলা বলত, 'আমাদের আবার দেশী বিদেশী কিলো। আমাদের ঘরে যে আসবে সেই আপন। কথা না বুঝলে ক্ষতি নেই। ভাবভঙ্গি ইশারাই যথেষ্ট। ওলো আমাদের আর কোন মিলেরই দরকার নেই। মনের মিলেরও না।'

কিন্তু সুধা কখনো মাথা ধরা, কখনো গা বমি বমি করার অজুহাত দিয়ে ওসব আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ এড়িয়ে যেত। কেন যেন বাইরে এসে তার মনটা একেবারে বদলে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল দেবতার স্থানে এসব করা পাপ।

গোবিন্দ বলেছিল, 'ব্যবসা একেবারে না করে পারবে না। তোমাদের পক্ষে লোভ সামলানো কঠিন। কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করতে যেয়োনা। তাহলে আর গাইতে পারবে না। গান বাজনাটা সাধনার জিনিস, সংযমের জিনিস। গান নিজেই একটা বাড়াবাড়ি। যারা এই বাড়াবাড়ি নিয়ে মেতে উঠতে পারে, তাদের অন্য বাড়াবাড়ির দরকার হয় না।'

গোবিন্দের কথাগুলি মন দিয়ে শুনত সুধা। চোখের ওপর দেখত—একজন মানুষ শুধু একটা নেশা নিয়েই কি করে জীবন কাটিয়ে যেতে পারে। নিজেও দেখত—যখন গানের রেওয়াজ করে, রিহার্শেল দেয়, অনেক রাত পর্যন্ত আসরে মুজরো করে, তখন অন্য কোন রকম ক্ষুধাতৃষ্ণার সাধ-আহ্লাদের কথা যেন মনে থাকে না। এক গানের মধ্যেই সব যেন মিটে যায়।

বাইরের কেউ যখন সুধাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আসত সে একটা না একটা অসুস্থতার অজুহাত খাড়া করত। ভাবখানা এই—গোবিন্দদাকে সে দেখিয়ে দেবে সংযম কাকে বলে। পরেশকে দেখাবে, সে কতখানি নির্লোভ হতে পারে।

কিন্তু একবার বড় বিপদে পড়ে গিয়েছিল। জগৎ মহান্তি নামে ছোটখাট এক জমিদারের বাড়িতে সে রাত্রে গান গাচ্ছে। সুধার কীর্তন শুনে আর রাধা-নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন জগৎবাবু। নিজের হাতে মালা ছুঁড়ে দিলেন, সোনার মেডেলের কথা ঘোষণা করলেন। আর এক রাত্রের বায়নার টাকা আগাম দিয়ে দিলেন পরেশের হাতে গুঁজে, পরেশ তো মহাখুশি।

আসর ভাঙবার পর ডাক পড়ল সুধার। জগৎবাবু তার সঙ্গে আলাপ করতে চান। এ আলাপের মানে যে কি—তা সুধার বুঝতে বাকি নেই। তার মুখের হাসি আর চোখের তাকাবার ভঙ্গি দেখেই সুধা বুঝতে পেরেছে। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। অল্প বয়সের মত ওই বয়সটাও মারাত্মক। সুধা অমন অনেককে দেখেছে। কিন্তু তারই বা ভয় কি। সে তো আর কুলের বউ নয়। বরং ফিরে আসবার সময় তার দু'হাত ভরে দেবেন জগৎবাবু।

কিন্তু সুধা বলল, 'না যাব না। আমার শরীর ভাল না, মন ভাল না, যাব না আমি।'

পরেশ বলল, 'সে কিরে। না গেলে যে কত বড় লোকসান তা ভেবে দেখেছিস। কত বড় লোক, কত ক্ষমতা।'

সুধা তার মুখোমুখি দাঁড়াল। স্থির দৃষ্টিতে পরেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ম্যানেজার, তুমিও এই কথা বলছ। আমার ওপর এই তোমার মায়া মমতা আর দরদ? তুমি কি শুধু নিজের বউকে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে সোহাগ করতে পার? আর বিদেশে এসে বাইরের একজন লোকের হাত থেকে তোমারই দলের একটা মেয়েকে রক্ষা করতে পার না? এই তোমার মুরোদ?'

ভাড়াটে মাটির বাসা। ঘরখানার মধ্যে তখন আর কেউ নেই। অবশ্য বাইরে এদিকে সেদিকে আড়ি পেতে রয়েছে। গোবিন্দদা

নিজের মনে বারান্দায় বসে বিড়ি টানছে। কেউ তাকে না ডাকলে এ সব ব্যাপারের মধ্যে সে বড় একটা আসতে চায় না।

সুধার বেশ মনে আছে তার কথা শুনে পরেশ তার দিকে এক মুহূর্ত বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছিল। সুধার পরণে তখনো ছিল রাধারাণীর বেশ। মুখে রাধারাণীর ওড়না।

পরেশ তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আচ্ছা তুই ঘরেই থাক, তোর আর যেতে হবে না। জগৎবাবুর কাছে যা বলবার আমিই বলে আসছি।'

অন্ধকারের মধ্যে পরেশ তখনই বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে আসতে আধঘন্টার বেশি দেরি করেনি। এসে বলেছিল, 'ঠিক আছে। তোর আর কিছু ভাবতে হবেনা।'

সুধা কৌতূহলী হয়ে বলল, 'কী বলে এলে জগৎবাবুকে?'

পরেশ বলল, 'সুধা আমার বিয়ে করা বউ। ওর পেটে আমার সন্তান। ও তাই নিয়ে মহারাজার কাছে আসতে লজ্জা পাচ্ছে।'

সে কথা শুনে জগৎবাবু জিভ কেটে বলেছিলেন, 'ছি ছি ছি। তার আসতে হবে না, আসতে হবে না। এ কথা তুমি আগে বলনি কেন?'

পরেশের কথা শুনে সুধাও লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল! 'ছি ছি ছি, ওকথা তুমি কেন বলতে গেলে?'

পরেশ বলল, 'না বললে উদ্ধার মিলত না।'

তখনও ময়না পেটে আসেনি। তার নামগন্ধও কোথাও নেই। তবু বানিয়ে মানিয়ে কত বড় একটা মিথ্যা কথা বলে এল পরেশ। মানুষটা সব পারে।

পরেশ আর গোবিন্দ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য বেরিয়ে গেলে ইরা, বেলা দুজনে এসে সুধাকে ঘিরে ধরল। কেউ উলু দেয়, কেউ হেসে গড়িয়ে পড়ে। দুজনেই বলল, 'আজ আমরা বাসর জাগব। বিয়ের খাওয়াটা কিন্তু ভালো করে খাওয়াতে হবে

ভাই রাধারাণী। পোলাও মাংস ছাড়া আজ আর আমরা কিছু মুখে তুলছিনে।'

সুধা হেসে জবাব দিয়েছিল, 'বলগে তোদের ম্যানেজারের কাছে, আমি কি জানি।'

বেলা বলেছিল, 'আরে দিদি, আজ তো তুই ম্যানেজারনি। ম্যানেজারের গিন্নী।'

সেখান থেকে তারা যখন পুরীতে গেল পরেশ দলের নাম দিয়েছিল—সুধা হালদার ও সম্প্রদায়।

সুধা লজ্জিত হয়ে বলল, 'ও আবার কি নাম। আমার নামে দলের নাম রাখছ কেন?'

পরেশ বলল, 'রাখলাম তোর পয় ভালো বলে। তুই আসার পর থেকে দলের খুব লাভ হচ্ছে। নাম-ডাকও মন্দ হয়নি। আগে এতটা ছিল না।'

সুধা বলল, 'তা না হয় হল। কিন্তু আমি আবার হালদার হলাম কবে থেকে?'

পরেশ ঠাট্টার সুরে.বলল, 'যবে থেকে তুই আমার বিয়ে-করা বউ হয়েছিস। যে সে মানুষ নয়, রাজাবাহাদুর জগৎ মহান্তি সাক্ষী আছে।'

গোবিন্দদার কিন্তু এসব ঠাট্টা তামাসা ভালো লাগেনি। সে তখনই পরেশকে ধমক দিয়ে বলেছিল, 'বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তোমার। ঘরে বউ রয়েছে। তার সঙ্গে আজই না হয় ঝগড়া। চিরকাল তো আর ঝগড়া থাকবে না। একদিন মিটমাট হয়েই যাবে। কথাটা কানে গেলে তার মনের অবস্থা কিরকম হবে বল তো।'

পরেশ বলেছিল, 'কিছুই হবে না। সে বরং বেঁচে যাবে। গোটাকয়েক ভগ্নীপতি আছে। তাদের মধ্যে একটা উপপতি। তাকে পুরোপুরি পতি করে নেবে। তার টানেই তো বাপের বাড়ি

গিয়ে পড়ে থাকে। আমি কি আর তা জানিনে? আমার সেই ভায়রা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সাক্ষাৎ এক ঋষি। আর তার শ্যালিকা-সুন্দরীর ঋষিপত্নী হবার ভারি শখ। আমি সবই খবর রাখি।'

গোবিন্দ বলেছিল, 'ছি ছি ছি! কি সব যা তা বলছ।'

পরেশের বউয়ের প্রসঙ্গ সুধারও ভালো লাগত না। তার কথা না উঠলেই সুধা সুখে থাকত, নিশ্চিন্তে থাকত। সেবার ফাঁকে ফাঁকে সুধাকে অনেক জায়গা, মন্দির, আর দেবদেবী দেখিয়েছিল পরেশ। পুরীর সমুদ্রে স্নান করিয়েছিল, জগন্নাথের মন্দির দেখিয়ে-ছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দির তো আগেই দেখে এসেছে। পরেশের ভাব দেখে মনে হয়েছিল সে যেন গানের দল নিয়ে আসেনি, বেড়াতে এসেছে। বাসে করে কোনারক বলে আর একটা জায়গায় সুধাকে নিয়ে গিয়েছিল পরেশ, জায়গায় জায়গায় ভেঙে গিয়েছে মন্দিরটা। যুগযুগান্তর আগের নাকি জিনিস। ভাঙবে না? তবু অনেক মূর্তিই আস্ত আছে। সুধার মনে হল যেন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এক এক জায়গায় মেয়ে-পুরুষের সে কি যুগলরূপ! দেখলে সুধার মত মেয়েরও লজ্জা লাগে। চোখ বুজে থাকতে ইচ্ছা হয়। সুধা হেসে বলেছিল, 'ছি ছি ছি, এত লোকের সামনে লজ্জাও করে না। দেবতার বেলায় লীলা খেলা, আর মানুষের বেলায় বুঝি দোষ?'

পরেশ হেসে বলেছিল, 'দেবতা না রে, দেবতা নয়। ওরা আমাদের মতই মানুষ।'

সুধা অবাক হয়ে বলেছিল, 'মানুষ! ওরা দলশুদ্ধ কার শাপে এমন পাষাণ হয়ে রয়েছে গো?'

পরেশ জবাব দিতে পারেনি।

আর এক জায়গায় একটি মেয়ে খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে থেমে গেছে। পাষাণী হয়ে গেছে সেও। যত নাচিয়ে গাইয়ে সব পাষাণী।

সুধা এক একটা মূর্তির সামনে দাঁড়ায়, আর জোড় হাতে

নমস্কার করে। আর একটি নাচিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুধা বলল, 'আচ্ছা, কারো শাপে আমিও যদি অমন পাষাণ হয়ে যাই কেমন হয় বল তো?'

পরেশ বলল, 'ও কথা বলছিস কেন সুধা? তুই পাষাণ হবি কোন দুঃখে।'

সুধা বলল, 'আহা, মানুষ কি কেবল নিজের দুঃখেই পাষাণ হয়? এখানে এসে তোমার বউয়ের কথাটা আমার বড্ড মনে পড়ছে। দেখ, এর আগে কত লোক আমার ঘরে এসেছে, আবার বিদায় নিয়ে চলে গেছে। কেউ দুদিন, কেউ চারদিন, কেউ বড়জোর দুমাস কি তিন মাস। কাউকে চিরকালের জন্যে ঘর-ছাড়া করিনি। তোমাকে নিয়ে এত যে পাপ করছি তা কি ধর্মে সইবে? আমার বড় ভয় লাগে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার দল থেকে তাড়িয়ে দাও। আমি যেখানে ছিলাম সেখানে চলে যাই।'

এ কথা শুনে সেই পাথরের রাজ্যে, সেই পাথরের মেয়ে-পুরুষ-গুলির মধ্যে পরেশও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল খানিকক্ষণের জন্যে—যেন পাথর বনে গিয়েছিল সেও। কথাগুলি বলে ফেলে সুধাও পাথরের মূর্তির মতই নিশ্চল হয়ে রয়েছিল। শত শত পাথরের মূর্তির মধ্যে যেন আর এক জোড়া মূর্তি বাড়তি হয়ে পড়েছে। আর যে সব যাত্রী এসেছে তারা কেউ লক্ষ্য করছে না, তাই বুঝতেও পারছে না। পাথরের মূর্তিগুলিকে সহজেই পাথর বলে চেনা যায় কিন্তু মানুষ যখন ভিতর থেকে পাথর হয়ে থাকে—তখন কি কেউ তাকে অত তাড়াতাড়ি চিনতে পারে?

একটু বাদে পরেশ তাড়া দিয়ে বলেছিল—'চল চল, সন্ধ্যা হয়ে গেল, চল এবার।'

আমি ওদের বিয়েতে শুধু যে সাক্ষী হলাম তাই নয়, একটা বাঁশীর সঙ্গে গোটা কয়েক তুলিকে একটি রঙীন সুতোয় বেঁধে ওদের উপহার দিলাম।

অদিতি বলল, 'এ কি।'

বললাম, 'এ বিয়ে যে চিত্রের সঙ্গে সঙ্গীতের, তারই একটু ছোট্ট নিদর্শন।'

অদিতি হেসে বলল, 'আপনি কবিতা লেখেন না কেন?' বললাম, 'আমি কবিতা লেখি না, কবিতা দেখি। এই যেমন আমার সামনে দুটি পংক্তিকে দেখতে পাচ্ছি।' মৃগাঙ্ক বলল, 'দেখ সুব্রত, তুমি আমাকে বলবে 'তুমি' আর আমার বউকে বলবে 'আপনি', তা হ'তে পারে না। তোমরাও দুজনে তুমি হয়ে যাও।'

থিয়েটার রোডে তিনখানা ঘরওয়ালা একটি ফ্লাট নিল মৃগাঙ্ক, বাড়ি থেকে সে কিছু না পেলেও, অদিতি হাজার পাঁচেক টাকার চেক তার বাপ মার কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। এসব ব্যাপারে মেয়েদের বুদ্ধি বিবেচনা বেশি। সংসার যে শুধু সুরে আর রঙে চলে না, চাল ডালেরও দরকার হয়, সে হিসেব অদিতির ছিল। কিন্তু প্রথম প্রেমের বন্যায় মৃগাঙ্ক সব হিসেবের খাতা ভাসিয়ে দিল। নবাব বাদশার মত সে ঘর সাজাল। দামী দামী ফার্নিচার কিনল, দেশী বিদেশী আর্টিস্টদের ছবির ভালো ভালো প্রিন্ট কিনে বাঁধিয়ে রাখল। নিত্য নতুন রঙের পর্দা, নিত্য নতুন নামের ফুল আনল হগ মার্কেট থেকে, তার অনেক ফুলেরই গন্ধ নেই, শুধু রঙ আছে।

মৃগাঙ্ক বলল, 'সুব্রত, জীবনে রঙটাই সব।'

স্টুডিওতে কাজ করবার সময় সে কড়া চুরুট ঠোঁটে চেপে চড়া রঙের বাটি নিয়ে বসে। আর কিছুতে তার মন ওঠে না।

আমি বললাম, 'মৃগাঙ্ক, বিয়েতে বউকে উপহার টুপহার কিছু দিয়েছ?'

মৃগাঙ্ক স্ত্রীর একখানা বড় অয়েল পেন্টিং দেখাল। সেই পোস্ট-

কার্ড আকৃতির ফটোখানাকে এনলার্জ করেছে। মৃগাঙ্ক বলল, 'রঙ ছাড়া আমার ওকে কিছু দেওয়ার নেই। সুর ছাড়া আমি ওর কাছ থেকে কিছু চাইনে।'

অদিতি কিছু বলল না। নীরবে আমাদের কাপে চা ঢালতে লাগল। আর ওর সেই মৌন গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো মৃগাঙ্ক ভুল করেছে। অদিতির আরো কিছু চাইবার ছিল, অদিতির আরো কিছু চাইবার আছে।

তারপর বছর খানেকের মধ্যে ভোজবাজির মত সেই পাঁচ হাজার টাকা ওদের উড়ে গেল। শেষে এমন হোল যে ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, বাড়ি ভাড়ার জন্যে দারোয়ান এসে অপমান ক'রে যায়। শেষে আমার কাছে পর্যন্ত ওদের হাত পাততে হোল। আমি হাত পাতলাম গিন্নীর কাছে, দুচার জন বন্ধুর কাছে। যা জোগাড় করতে পারলাম ওদের ধ'রে দিলাম।

অদিতিকে বললাম, 'তুমি তো মেয়ে, তুমি তো গৃহিণী, তুমি কেন রাশ টেনে ধরলে না? তুমি কেন নিজের মুখ বন্ধ রেখে থলির মুখ খুলে দিলে?'

অদিতি বলল, 'নিষেধ কি আমি করিনি সুব্রত, যথেষ্ট করেছি। কিন্তু অসুবিধে কি জানো, টাকাটা যে আমার, টাকাটা যে আমার বাপের বাড়ি থেকে আনা। ও আমার জন্যে এত ছাড়ল, আর আমি সামান্য পাঁচ হাজার টাকা ছাড়তে পারব না?'

থিয়েটার রোডের ফ্লাট মৃগাঙ্ককে ছেড়ে আসতে হোল। সেই সঙ্গে দামা দামী কতকগুলি ফার্নিচারও গেল। বউবাজার স্ট্রিটে চল্লিশ টাকা ভাড়ার ছোট একটি ফ্লাট আমিই ওদের ঠিক করে দিলাম। দুখানা ঘর আছে। আলাদা কিচেন, বাথরুম আছে।

রাস্তার ধারে এক ফালি বারান্দাও রয়েছে দাঁড়াবার বসবার। কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মৃগাঙ্কদের অবস্থা তো জানি। রাজ রাজড়ার ঘরে ও জন্মায়নি। মধ্যবিত্ত উকিলের ছেলে। ওর পক্ষে এইসব বাড়িই মানায়। কেন যে হঠাৎ ও এমন আমিরী চালে চলতে গেল তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। ভালোবেসে বিয়ে তো আজকাল অনেকেই করে, কিন্তু এমন চড়া গলায় প্রেমালাপ করে কে। আমার মনে হয়, বিয়ে করার পর থেকেই মৃগাঙ্ক ক্লান্তি বোধ করছিল। কপোত-কপোতীর মত স্বামী-স্ত্রীর যে সংসার তা তার পোষাচ্ছিল না। হাজার হোক হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরে একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে। মা-বাপ, কাকা-কাকীমা, একদল আপন ঘরের খুড়তুতো, জেঠতুতো ভাইবোনের মধ্যে মানুষ হয়েছে মৃগাঙ্ক। তাদের ছেড়ে এসে ভিতরে ভিতরে ও বোধ হয় নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। ব্যক্তির অভাব মেটাতে চাইছিল বস্তু দিয়ে।

মাঝে মাঝে যখন আমার কাছে মন খুলত মৃগাঙ্ক, ওর সেই ভিতরের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গকামী মানুষটি বেরিয়ে আসত। মৃগাঙ্ক বলত, 'আর কারো জন্যে নয় সুব্রত, আমার সেই খুড়তুতো বোন বুড়ির কথাটা মনে হলেই বুকের ভিতরটা যেন কেমন ক'রে ওঠে। ছেলে বেলায় ওকে আমি নিজের হাতে লেখাপড়া শিখিয়েছি। কাক এঁকে খরগোস গরু এঁকে অক্ষর পরিচয় করিয়েছি। বইয়ের আঁকা ছবি ওর পছন্দ হোত না। রঙীন পেনসিল দিয়ে রাঙাদার নিজের হাতে এঁকে দেওয়া চাই।'

আবার বলত, 'সুব্রত, এত রান্না খেলাম, কিন্তু আমার জেঠীমা ডাঁটা আর কাঁঠালের আঁঠি দিয়ে যে নিরামিষ তরকারি রাঁধতেন তার স্বাদ কোথাও পেলাম না। তা যেন আমার মুখে আজও লেগে রয়েছে।'

আমি বলতাম, 'চল যাই আমাদের বাড়িতে। আমার মাও নিরামিষ তরকারি মন্দ রাঁধেন না।'

কিন্তু আমার মা আর স্ত্রীর অমুদার শুচিবায়ুতার কথা ওর জানা ছিল। ও বলত, 'না সুব্রত থাক। ওঁদের আর বিব্রত করে কাজ নেই।'

সেই ডাঁটার ঝোলের স্বাদ যখন জীবন থেকে একেবারে উঠে গেছে, তখন চালাও কোর্মা-কালিয়া, কারি-কাবাব। সেই একান্ত স্নেহভাজন ভাইবোনদের যখন আর সাড়া মিলবে না, ছোঁয়া মিলবে না, তখন আসবাবপত্রে ঘর বোঝাই কর, হৃদয়ের দোর জানলা ঢেকে দাও পুরু পর্দায়।

ওরা দুজনে উঠে এল বউবাজার স্ট্রিটের সেই ছোট ফ্ল্যাটে। ঠিক দুজনে নয়, বলতে ভুলে গেছি আরো একজন ছিল। কিন্তু সে এতই আড়ালে আড়ালে থাকত, যে বহুদিন পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি, আলাপই হয়নি, আলাপ করবার ইচ্ছাই জাগেনি। তাছাড়া কোন পরিবারের কথা বলতে গিয়ে কেউ কি তার ঝি-চাকরের কথা মনে রাখে, না হিসেব রাখে। এডিথও ওদের ঝি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঝিতে ঝি, চাকরে চাকর, রান্নাবান্নার কাজ বেশির ভাগ সেই দেখত। নামটা ইংরেজী হলেও এডিথ জাতে ইংরেজ ছিল না, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানও নয়, একেবারে খাস বাঙ্গালী। কোন একটা অর্ফানেজ থেকে অদিতির বাবা ওকে কুড়িয়ে এনে বাড়ির পরিচারিকার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বয়স অদিতিরই মত কি দু' এক বছরের ছোট বড় হতে পারে। ঘরকন্নার কাজে খুব পাকা বলে মেয়ের সঙ্গে অবনীবাবু ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এডিথের রঙ ছিল ঘোর কালো, অনেকটা সাঁওতালদের মত। মুখের আদলটাও তাই। তবে নাক চোখ টানাটানা থাকায় শ্রী টুকু নেহাৎ মন্দ ছিল না। যখন মুখ বদলাবার দরকার হোত মৃগাঙ্কের, ইচ্ছে হোত ছোট জাতের কোন মেয়ের ছবি আঁকবার, মৃগাঙ্ক এডিথকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করত।

নতুন বাড়িতে মাত্র দু'খানা ঘর থাকায় সমস্যা উঠল এডিথ

মৃগাঙ্ক লাথি দিয়ে অদিতির হারমোনিয়ম ভেঙেছে, তানপুরার তার-গুলি ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে রাস্তায়। অদিতিও শোধ নিতে ছাড়েনি। তারপর প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। এডিথ না থাকলে ওরা খুনোখুনি হয়ে মরত। কিন্তু থেকেই বা সেই খুনোখুনিকে আটক রাখতে পারবে কতদিন ?

এডিথ আমার দিকে তাকিয়ে কাতরভাবে বলল, 'এদের বিয়ে না করাই ভালো ছিল মিঃ চক্রবর্তী।'

বললাম, 'তুমিও এই কথা বলছ।'

এডিথ বলল, 'বড় দুঃখে বলতে হচ্ছে মিঃ চক্রবর্তী। আপনি তো রাত-দিন থাকেন না, আপনি তো দেখেন না সব। আমার মনে হয় ওরা আর বেশিদিন একসঙ্গে থাকলে হয় দুজনেই দুজনকে খুন করবে, আর না হয় একজন মরবে, আর একজন ফাঁসি যাবে। ওরা কেউ বাঁচবে না। আপনি তো ওদের বন্ধু মিঃ চক্রবর্তী। আপনি ওদের বাঁচান। আমার তো কিছুই সাধ্য নেই। আমি কি করব, আমি কি করতে পারি। যীশুর মনে কি আছে তিনিই জানেন।'

এডিথের চোখ দুটি ছল ছল ক'রে উঠল।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাকে চা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ল না এডিথ। খেয়ে দেখলাম চা ও অদিতির চেয়ে ভালোই করে।

ওদের কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পেলাম না।

কিন্তু দুদিন বাদে ওরা নিজেরাই উপায় খুঁজে বার করল। সেদিন টিফিনের সময় আমার অফিসে হানা দিয়ে মৃগাঙ্ক বলল, 'তোমার কোন জানাশোনা উকিল আছে সুব্রত ?'

বললাম, 'কেন উকিল দিয়ে কি হবে ?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আমরা ডিভোর্স করব ঠিক করেছি। সস্তায় কাজ সেরে দিতে হবে।'

আমি অনেক বোঝালাম, অনেক রকম যুক্তিতর্ক দিলাম। কিন্তু মৃগাঙ্ক অটল।...

আমি অবশেষে বললাম, 'তুমি অদিতিকে কি দোষে ত্যাগ করতে চাও?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'দোষ! যে আমার ছবি ছিঁড়ে ফেলেছে তাকে ত্যাগ করা তো ভালো, তাকে আমি খুন করতে পারি।'

বললাম, 'তুমি তো ওর হারমোনিয়ম ভেঙেছ, তানপুরা ছিঁড়েছ। শোধ-বোধ গেছে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'না, শোধবোধ যায়নি। তবলা আর তানপুরা বাজারে হাজার হাজার কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমার ছবি তো শুধু বাজারের রঙ নয়, আমার জীবন নিংড়ানো রস। সেই রস ও নর্দমায় ঢেলেছে। এর শোধ যায় গলা কাটলে, এর শোধ যায় শুধু রক্তে।'

এডিথের কথা আমার মনে পড়ল। আমি আর কিছু বললাম না।

কিন্তু ডিভোর্স মামলায় শুধু উকিল হলেই তো চলে না। উপযুক্ত কারণও চাই। আসলে পাগল হয়েও দুজনের কেউ পাগল বলে নিজেকে স্বীকার করতে রাজি নয়, ক্লীব বলে সাব্যস্ত হতে রাজি নয়। ব্যভিচারের দোষটাও নিজের ঘাড়ে নিতে সহজে কেউ রাজি হয় না। অথচ দুজনেই বিবাহিত জীবনের পূর্ণচ্ছেদ চায়। এই চাওয়াটাই আসলে যথেষ্ট। কিন্তু আদালতের আইন অন্যরকম।

মৃগাঙ্ক বলল, 'বেশ। মিথ্যা দোষটা আমিই নেব। আমি তোমাদের ধর্মও মানিনে, ভূয়ো এথিকসেরও ধার ধারিনে। আমি মানি শুধু আমার আর্টকে। তার পথে যা বাধা তাকে আমি ছলে বলে কৌশলে যেভাবে পারি সরাব।'

কিন্তু দোষের আর একজন ভাগীদার চাই। মৃগাঙ্ক ছুটল রিনি

পালিতের কাছে। বলল, 'রিনি, তুমি রাজি হও। আমার ছবিতে তোমাকে আমি অমর করে রাখব।'

রিনি হেসে বলল, 'তুমি বিপদে পড়েছ, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই তরাব না হলে আর বন্ধু কিসের। বেশি কিছু নয়, মাত্র হাজার দশেক টাকা দাও। আমার সাগর পাড়ি দেবার পারানি। আমি তোমাকে পার করি, তুমি আমাকে পার কর। জানো তো এসব ব্যাপারে যে কালি লাগবে সাগরের জল ছাড়া তা উঠবে না।'

মুখ কালো করে বাড়িতে এল মৃগাঙ্ক। সিঁড়িতে মুখোমুখি হোল এডিথের সঙ্গে। তার পথ আগলে স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল মৃগাঙ্ক।

এডিথ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার মিঃ চ্যাটার্জি। আপনি কি কিছু বলবেন ?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ, তুমি যাচ্ছ কোথায় ?'

এডিথ বলল, 'ছুটো ডিম আনতে যাচ্ছি। ঘরে কোন খাবার নেই।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'দরকার নেই খাবারের, দরকার নেই ডিমের। তুমি ঘরে এসো।'

ঘরে নিয়ে গিয়ে মৃগাঙ্ক তাকে সব খুলে বলল, বলল 'তুমি রাজি হও এডিথ, তুমি যা চাও তাই দেব।'

এডিথ মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে জিভ কেটে বলল 'আমি! এ আপনি কি বলছেন মিঃ চ্যাটার্জি!'

কিন্তু শুধু মিঃ চ্যাটার্জিই নয়, মিসেস চ্যাটার্জিরও সেই কথা। অদিতি ওর ছুহাত ধরে বলল, 'তুই আমার আপন বোনের চেয়েও বড়। তুই আমাকে বাঁচা। আমার বাঁচবার আর কোন পথ নেই। তোর কোন পাপ হবে না। আমি সব পাপের ভার নেব।'

এডিথ ম্লান হেসে বলল, 'একজনের পাপের ভার কি আর একজনে নিতে পারে অদিতিদি ?'

পরক্ষণে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃস্টের সেই ছোট ছবিটির দিকে চোখ পড়ল এডিথের। হ্যাঁ, একজন নিয়েছিলেন। একজন জগতের সব পাপের ভার ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন। সেই নেওয়ার পালা আজও শেষ হয়নি। আজও তিনি একজনের মধ্যে থেকে আর একজনকে নেন। আজও তিনি একজনের মধ্যে বসে আর একজনের জন্যে কাঁদেন।

এডিথ বলল, 'তোমরা কি সত্যিই এই চাও ? এতে কি তোমরা সুখী হবে ?'

অদিতি বলল, 'সুখ তুচ্ছ, তার চেয়ে বড় বেঁচে থাকা। এভাবে থাকলে আমরা দুজনেই মরব।'

সারাদিন এডিথ নাইল না, খেল না। সারা রাতের মধ্যে ঘুমোল না, শুধু কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাইবেল পড়তে লাগল আর বুকের ওপর আঁকতে লাগল ক্রুশ চিহ্ন। পাল্লার একদিকে দুজনের জীবন, আর একদিকে নিজের ক্ষুদ্র মান-সম্মান। জীবনই বড়, জীবনই ভারি। তার জন্যে সব করা যায়, তার জন্যে সব ছাড়া যায়।

পরদিন রাজি হোল এডিথ। তারপর খুব বেশি ঝামেলা পোহাতে হোল না। কোর্টে মৃগাঙ্ক আর এডিথ দুজনে কবুল করল তারা পরস্পরের প্রণয়ী, তারা পরস্পরকে চায়।

ফিরে এসে মৃগাঙ্ক একখানা একশ টাকার নোট এডিথের হাতে গুজে দিল।

এডিথ বলল, 'এ কি মিঃ চ্যাটার্জি।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'এর চেয়ে বেশি কিছু দেওয়ার সাধ্য আজ আর আমার নেই এডিথ। আমি যথাসর্বস্ব বেচে এই টাকা সংগ্রহ করেছি। পারি তো আরো কিছু পরে দেব। না, এ টাকা তুমি ফিরিয়ে দিতে পারবে না। এ তোমাকে নিতেই হবে।'

নোটখানা মেলে ধরল এডিথ, বলল, 'নিতেই হবে ?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ।—তুমি এত দিলে আর কিছুই নেবে না তাই কি হয় ?'

তা হয় না। কেবল দিলেও হয় না, নিতেও হয়।

এডিথ বলল, 'তবে নিলুম মিঃ চ্যাটার্জি, তবে নিলুম।'

ওর দু'চোখের জল সেই একশ টাকার নোটের উপর গড়িয়ে পড়ল।

তারপর বউবাজারের ফ্লাট রাখবার আর কোন প্রয়োজন হোল না। মৃগাঙ্ক মির্জাপুরের একটা সস্তা মেসে গিয়ে উঠল। অদিতি বিডন স্ট্রিটের যে মিশনারী স্কুলটায় মাস্টারি করত তারই বোর্ডিংয়ে একটা সীট পেল। আর এডিথ ক্রীক রোয়ে একটি মাদ্রাজী ক্রিশ্চিয়ান পরিবারে আয়ার কাজে নিযুক্ত হোল।

মাস কয়েক আমি আর ওদের কোন খোঁজ-খবর রাখতে পারলাম না। নেওয়ার যে তেমন চেষ্টা করলাম তাও নয়। কিন্তু মৃগাঙ্কই নিল খোঁজ। সে-ই একদিন এসে হাজির হোল আমাদের আফিসে। বলল, 'সুব্রত, আমি বিলাত যাচ্ছি।'

আমি তো অবাক! বললাম 'বল কি হে! টাকা পেলে কোথায়! লটারিতে ?'

মৃগাঙ্ক হেসে বলল, 'প্রায় সেই রকমই।' তার বাবাই মরবার আগে হাজার দশেক টাকা ভাগের ভাগ তার নামে রেখে গেছেন। স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে বড় ছেলেকে একেবারে বঞ্চিত করে যেতে পরেননি। কৃপণ হিসেবী লোক ছিলেন যোগেনবাবু। ছেঁড়া গাউন ছাড়া তাঁর পরনে আর কিছু আমরা দেখিনি। কিন্তু মরবার পর দেখা গেল হাজার পঞ্চাশেক জমিয়ে গেছেন।

মৃগাঙ্কের মা ছেলেকে দেখে বললেন, 'যাক পেত্নী ঘাড় থেকে নেমে গেছে বেঁচেছি। কোষ্ঠীতে তোর রাহুর দশা যাচ্ছে। এরকম হবেই। তোর দোষ নেই, সব আমার ভাগ্যের দোষ। যাক এখন

কালীঘাটে গিয়ে হিন্দু মিশনে শুদ্ধি করে, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আয়। কর্তার এগার দিনের শ্রাদ্ধ তো করতে পারলিনে। কিন্তু বছরকিটা কর।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'করব মা। তার আগে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।' মা প্রথমে কিছুতেই রাজি হতে চান না। ভাইদেরও অমত। বিলাত থেকে কি ডিগ্রী নিয়ে আসবে মৃগাঙ্ক? ওর কি যোগ্যতা আছে? কিন্তু ডিগ্রী নেওয়া তো মৃগাঙ্কের উদ্দেশ্য নয়। ওর ইচ্ছা নানাযুগের শিল্পীদের যে তীর্থস্থান রোম আর প্যারিস, নিজের চোখে তা দেখে আসা। আর যদি কোন শিল্পী গুরু জুটে যায় তো ভালই। মৃগাঙ্কের মেজোভাই শশাঙ্ক দিল্লীতে ভালো সরকারী চাকরি করে। সেই চেষ্টা চরিত্র করে পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিল। মৃগাঙ্ক চলে গেল আমাদের চোখের আড়ালে। দূরদেশ যাত্রী পুরোন বন্ধুকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত তুলে দিয়ে এলাম। কিছু-ক্ষণের জন্যে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল, বললাম, 'চিঠি দিয়ো।'

মৃগাঙ্ক ঘাড় নেড়ে প্রতিশ্রুতি দিল।

লণ্ডনে পৌঁছে মৃগাঙ্ক চিঠি একটা দিয়েছিল। কিন্তু তার পর আর কোন সাড়াশব্দ পেলাম না, মাস কয়েক বাদে ওর ছোট ভাই হেমাঙ্গের কাছে যে খবর পেলাম তা ভারি নৈরাশ্যকর। মৃগাঙ্ক যেখানে সেখানে খুশি মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা তা করে টাকাগুলি নষ্ট করছে। তার নিজের সঞ্চয় তো গেছেই মার পুঁজিতেও টান পড়েছে। অথচ সব টাকা এমন খাম-খেয়ালে খরচ করলে চলবে কি করে। মৃগাঙ্কের দুটি বোন আছে, তাদের বিয়ে দিতে হবে। অল্প কদিনের মধ্যে পারিবারিক সহানুভূতি হারিয়ে ফেলল মৃগাঙ্ক। মার স্নেহ পর্যন্ত গেল।

অদিতির খবর যা কানে আসতে লাগল তাও ভালো নয়। তারও বাবা মারা গেছেন। কিন্তু ছেলে মেয়ে কারো জন্যেই কিচ্ছু রেখে যেতে পারেননি। ভাইদের সঙ্গেও অদিতির আর কোন যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু এর চেয়েও খারাপ খবর মিশনারী স্কুল আর বোর্ডিং থেকে অদিতি বিতাড়িত হয়েছে। এই স্কুলের আর একজন টিচার মিস কর গুপ্তের সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল। তাঁর কাছেই শুনলাম এসব খবর। অদিতি কি স্কুলের কি বোর্ডিং-এর কোন নিয়মই মেনে চলতে পারেনি। সঙ্গীত সাধনাকে উপলক্ষ করে নানাজাতের নানা চরিত্রের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করেছে। তাদের অনেকেরই বাজারে দুর্নাম আছে। মিশন স্কুলের কর্তৃপক্ষ বার দুই অদিতিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তৃতীয়বারে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। শুনে ভারি দুঃখই লাগল মেয়েটির জন্যে। অমন একটি সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে। তার এই পরিণতি ঠিক যেন সহ্য করা যায় না। বিবাহিত জীবন সকলের হয়ত পোষায় না। কিন্তু জীবনযাপনের অন্য ভদ্র শোভন উপায়ও তো আছে। মেয়েটি ভালো গায়। তার চেয়েও গানকে বেশি ভালোবাসে। স্বামী প্রেম ওর না হয় নাই রইল। সেই সঙ্গীত প্রেমই তো ওকে রক্ষা করতে পারত। সমস্ত শিল্প সাধনাই রসের সাধনা, সেই রস যে কখন গেঁজে তাড়ি হয়ে ওঠে, সাধনার পথ থেকে শিল্পীকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তা অনেক সময়ই টের পাওয়া যায় না। যখন টের পাওয়া যায়, তখন আর ফেরবার পথ থাকে না। কারণ রসের নেশার চেয়ে তাড়ির নেশায় মাদকতা বেশি।

এই কথাগুলি আমার নতুন করে মনে হোল আরো মাস ছয়েক বাদে শ্যামবাজার অঞ্চলের একটি সিনেমা হাউসে অদিতির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার পর। সিনেমা আমি কদাচিৎ দেখি। বিশেষ ক'রে বাংলা আর হিন্দী ছবি প্রায় দেখাই পড়ে না। কিন্তু একজন বন্ধুর অনুরোধে সেদিন যেতে হোল। তিনি বক্সের দুখানা পাশ জোগাড়

করেছেন। যিনি পাশে বসবেন কথা দিয়েছিলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত আসেননি। তাই আমাকে নিয়ে টানাটানি। আমি বললাম, 'দুধের সাধ কি ঘোলে মিটবে।' তিনি বললেন, 'মিটবে।'

পাশের বক্সেই দেখলাম অদিতিকে। দেখে প্রথমটাতো চিনতেই পারিনে। পরনে জমকালো শাড়ি, গাভরা গয়না। এ কী ব্যাপার! ইতিমধ্যে দুএকটা জলসায় অদিতি গান গেয়েছে। দুএকটি ছবিতে প্লে ব্যাক করেছে বলেও শুনেছি। কিন্তু তাতে তো এত ঐশ্বর্য হওয়ার কথা নয়।

আমাকে দেখে অদিতি প্রথমে একটু চমকে উঠল। তারপর দ্বিগুণ সপ্রতিভতায় সেই চমকানিকে ঢেকে দিয়ে লিপস্টিক মাখা ঠোঁটে হাসির ঝিলিক এনে বলল, 'এই যে সুব্রত, তুমি এখানে।'

বললাম, 'ভাগ্যে এসেছিলাম, তাই দেখা হোল।'

আমার শ্লেষটুকু অদিতিকে বিঁধল। কিন্তু সে তা গোপন করবার চেষ্টা করে বলল, 'আমারও ভাগ্য। একটা বাজে ছবি দেখতে এসে একজন কাজের বন্ধুকে পেয়ে গেলাম। এসো এখানে।' বলে আমাকে তার পাশে ডাকল অদিতি, আমার বন্ধু বারবার ঈর্ষাকুটিল চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

অদিতিকে বললাম, 'ওখানে বসবার যোগ্যতা কি আমার আছে। হয়ত একটু বাদে যথার্থ অধিকারী এসে ঘাড় ধরে তুলে দেবেন।'

অদিতি বলল, 'অধিকারী আজ আর আসবেন না। তুমি নির্ভয়ে এসো।'

আমি তবু ইতস্তত করছি দেখে বলল, 'আহা এসোই না, বাড়িতে যাওয়ার আগে না হয় গঙ্গায় ডুব দিয়ে যেয়ো।'

এবার উঠে গিয়ে বসলাম অদিতির পাশে। তখন আসল ছবি আরম্ভ হয়ে গেছে। অদিতি খানিকক্ষণ চুপ চাপ দেখতে চেষ্টা করল।

তারপর বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'নাঃ, একেবারে বাজে। চল উঠি। চল একটু চা খাই।'

বললাম, 'চা?'

অদিতি বলল, 'হ্যাঁ চা, মারাত্মক কিছু না। তোমাকে এত দিন এত চা করে খাইয়েছি, আর তুমি এক কাপ চা খাওয়াতে আজ কার্পণ্য করছ?'

বললাম, 'চল।'

বাইরে এসে সামনের একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকতে গিয়েও অদিতি ঢুকল না। বলল, 'যা চেহারা ইচ্ছে করে না ঢুকতে। অনর্থক তোমার পকেটের পয়সা নষ্ট করে কি হবে। তার চেয়ে আমার বাড়িতে এসো, আমিই চা খাওয়াব। যদি তাতে অবশ্য তোমার জাত না যায়।'

বললাম, 'জাত তো গেছেই। চল। কোথায় তোমায় বাড়ি?'

অদিতি বলল, 'এই তো কাছেই।'

ওর পিছনে পিছনে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের একটি ফ্লাট বাড়ির তেতলায় উঠে এলাম। রাত তখন গোটা দশেক। মনে মনে ভাবলাম চা খাওয়ার সময়টির নির্বাচন ঠিক হয়নি। হিংসুক বন্ধুটি যদি আমাদের বাড়িতে গিয়ে এসব কথা রটায়, কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রণান্ত হবে।

বেশ প্রশস্ত, সাজানোগুছানো দুখানি ঘর। বউবাজারের ফ্লাটের সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না। সোফা সেট, ড্রেসিং টেবিল সবই আছে। আর একধারে বাঁয়া তবলা, তানপুরা, সেতার।

খাটের ওপর পুরু গদিতে শাদা ধবধবে চাদর বিছানো। তার নিচে দু জোড়া বালিশের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আমি একটু ভ্রূ-কুঁচকে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

বললাম, 'ফ্লাটটাতো ভালোই পেয়েছ।'

অদিতি বলল, 'তা পেয়েছি।'

খাটের নিচে একটি দামী গড়গড়ার দিকে আমার চোখ পড়ল। বললাম, 'ওটা কার ?'

অদিতি বলল, 'আমার ওস্তাদের।'

বললাম, 'ওস্তাদ ছাড়া আর কেউ নেই এখানে ?'

অদিতি একটু আরক্ত হয়ে বলল, 'সুব্রত তোমার কৌতূহলটা একেবারেই গোয়েন্দা পুলিশের মত।'

বললাম, 'তা বটে। তবু তোমাকে আমি গোটা কয়েক কথা বলব অদিতি।'

'বল।'

বললাম, 'এসব কি শুরু করেছ। তোমার মত মেয়ের এমন পাঁকে নামবার কি কোন প্রয়োজন ছিল ?'

অদিতি একটু হাসল, 'সুব্রত, এই বুঝি তোমার ব্রত কথা শুরু হোল ? পাঁকে না নামলে কি পঙ্কজকে তোলা যায় ? তা ছাড়া একে আমি পাঁক মনে করিনে।'

বললাম, 'তবে কি মনে করো।'

অদিতি বলল, 'মনে করাকরির কি আছে। এ পাঁকও নয়, চন্দনও নয়, এ যা তাই। দেহ যেমন আছে তার নানা রকম দাবিও আছে। নানারকম প্রয়োজনও আছে। সে প্রয়োজনকে সহজ-ভাবে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। আমি সন্ন্যাসিনী তপস্বিনী হয়ে থাকতে চাইনে। আমি শাড়ি গয়না ভোগ সুখ যশ প্রতিপত্তি সবই চাই। এই কৃপণ দেশ আর সমাজের কাছ থেকে যেভাবে যতটুকু আদায় করে নিতে পারি, তাই লাভ।'

যে রিনি পালিতকে অদিতি অত ঘৃণা করত, তার মুখের আদল আমি ওর মুখে দেখতে পেলাম, তার স্বর শুনলাম ওর গলায়।

কথায় কথায় মৃগাঙ্কের কথা উঠল। আমি বললাম, 'তার খবর রাখ ?'

অদিতি মুচকি হেসে বলল, 'রাখি বইকি। সেও এই চালেই

চলেছে। আমরা যত দূরেই থাকি আমাদের আলাপের সুর একই। সেহানবীশের বন্ধু মহলানবীশের সঙ্গে প্যারিস-এর এক বারে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

বললাম, 'সেহানবীশ কে?'

অদিতি বলল, 'নব ভারত পিকচার্স-এর একজন ডিরেক্টর। তাঁর বইতেই তো আমি এখন কাজ করছি।'

বললাম, 'ও, তা তোমার গানটান কেমন চলছে। গানের সুযোগ সুবিধে পাচ্ছতো?'

অদিতি বলল, 'নিশ্চয়ই, সেই জন্যেই তো আছি।'

ডিরেক্টরএর ওপর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অদিতি বলল, সেহানবীশ শহরের সবচেয়ে বড় ওস্তাদকে রেখে দিয়েছেন অদিতির জন্যে। সঙ্গীত চর্চার এত সুযোগ সে এর আগে কল্পনাও করতে পারত না। সেহানবীশের অনেক দোষ আছে। কিন্তু গানকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আর গায়িকাকে?'

রাগে কি অনুরাগে বুঝতে পারলাম না অদিতির গাল দুটি লাল হয়ে উঠল। একটু বাদে হেসে বলল, 'তুমি এত অভদ্র যে তোমার কান মলে দেওয়া উচিত।'

বিদায় দেওয়ার জন্যে অদিতি দোর পর্যন্ত এসেছে, সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনতে পেলাম, দামী ছাই রঙের স্যুট পরা বেশ ফর্সা লম্বা বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশের এক ভদ্রলোক চুরুট মুখে এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখে একটু ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। তারপর অদিতির দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি তোমার খোঁজে গিয়ে শুনি তুমি উঠে এসেছ।'

অদিতি বলল, 'হ্যাঁ। যা একখানা ছবি। দেখতে দেখতে মাথা ধরে গেল। আর গানের সুরগুলি তো অশ্রাব্য, তাতে মাথা ধরা আরো বাড়ে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ইনি কি মাথার রোগ বিশেষজ্ঞ তোমার কোন ডাক্তার বন্ধু ?'

অদিতি মধুর ভঙ্গিতে খিল খিল করে হেসে উঠল, 'চেহারা আর বেশবাস দেখে একে কি ডাক্তার বলে মনে হয় তোমার ? বড় জোর কম্পাউণ্ডার বলে আন্দাজ করা উচিত ছিল। না, ডাক্তারও নয় কম্পাউণ্ডারও নয়। এ আমাদের একজন হিন্দু পাদ্রী। মিঃ চক্রবর্তী, মিঃ সেহানবীশ।'

অদিতি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর আমরা দুজনে নমস্কার বিনিময় করলাম, আর সেই নমস্কারই আমাদের বিদায় নমস্কার হোল।

বছরখানেক বাদে চৌরঙ্গীর একটা রেস্টুরেণ্টে আমাদের আর একজন কমন ফ্রেণ্ড নৃত্যশিল্পী বরুণ চৌধুরীর সঙ্গে মৃগাঙ্কের কথা নিয়ে আলাপ করছিলাম। কথায় কথায় বললাম, 'সেই যে সে সাগরপাড়ি দিয়েছে, তার আর কোন খবরই নেই।'

বরুণ বলল, 'কে বলল খবর নেই, সাগর সে কবে সাঁতরে চলে এসেছে, তা জানো না বুঝি ?'

অবাক হয়ে বললাম, 'সাঁতরে এসেছে ?'

বরুণ বলল, 'প্রায় সেইরকমই। অনেক নাকানি চুবানি খেয়ে গ্যালন গ্যালন নোনা জল গিলে তারপর পারে এসে উঠেছে। সব নষ্ট করেছে, এমন কি স্বাস্থ্যটি শুদ্ধু। আলঙ্কারিক ভাষা ছেড়ে এবার নিরলঙ্কার হোল বরুণ।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, 'করছে কি ? আছে কোথায় ?'

বরুণ বলল, 'কিছুই করছে না। আছে ডিকসন লেনে। সেভেনটিন সি না ডি ওই রকমই কাছাকাছি একটা নম্বর।'

বললাম, 'চলছে কি করে ?'

বরুণ বলল, 'ওর তো কোন বাদ বিচার নেই জানই। শুনেছি নিচু শ্রেণীর একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে নাকি জুটিয়ে নিয়েছে। সেই করে কর্মে খাওয়াচ্ছে। তা এ একরকম মন্দ নয়। আমরা তো অরক্ষিত হয়েই আছি। ও তবু একজনের রক্ষিত হয়ে প্রাণরক্ষা করছে।'

মৃগাঙ্কের এই রুচিবিকৃতি আর দুর্দশার কথা শুনে দুঃখ বোধ করলাম। কিন্তু ওর ওপর যত বিতৃষ্ণাই আসুক, একবার খোঁজ না নিয়ে পারলাম না। জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে অফিস ছুটি। স্ত্রীকে বাজার টাজার সেবে দিয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম।

কানা গলির মধ্যে খুঁজে পেতে একটু কষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত পেলাম বাড়িটা। দোতলা পুরোন বাড়ি। ওপরে কয়েক ঘর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান থাকে। মৃগাঙ্কের নাম করতে আর বর্ণনা দিতে এক সাহেব বিরক্ত হয়ে একতলার কোণের দিকের একটি ঘর দেখিয়ে দিলেন। আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কড়া নাড়লাম। 'কে' বলে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম এডিথ। আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়েছে। একটু হেসে বলল, 'মিঃ চক্রবর্তী আসুন।'

বললাম, 'তুমি এখানে!'

এডিথ চোখ নত করে বলল, 'হ্যাঁ, আমি এখানেই আছি।'

বললাম, 'মৃগাঙ্ক কোথায় ?'

এডিথ বলল, 'তিনিও এখানেই। আসুন, ভিতরে আসুন।'

ছোট একখানা ঘর। পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষে একখানি তক্তাপোশ পাতা। সামনের দিকে খুব ছোট একটি জানালা। তার সামনে বসে মৃগাঙ্ক এক মনে কাগজ পেনসিলে স্কেচ করে চলেছিল। এডিথ ডেকে ওর ধ্যান ভাঙাল, 'ফিরে দেখ

কে এসেছেন।' ভ্রূকুঞ্চিত করে ফিরে তাকাল মৃগাঙ্ক, তারপর আমাকে দেখে মৃদু হেসে বলল, 'ও তুমি! এস, বস এসে।'

তক্তাপোশের ওপর একটা পুরোন মাদুর পাতা, সেখানে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল মৃগাঙ্ক।

আমি ওর পাশে বসে পড়ে বললাম, 'তোমার কাজের ক্ষতি করলাম।' মৃগাঙ্ক বলল, 'তাতো করেইছ। এখন আর ভদ্রতা কোরো না। কেমন আছ তাই বল। আমি কেমন আছি তাতো দেখতেই পাচ্ছ। তোমার কুশল সংবাদ এবার শুনি।'

খানিকক্ষণ অভিযোগ অনুযোগের পর বললাম, 'এই গর্তের মধ্যে কেন রয়েছ? একি কৃচ্ছ্রতা বিলাস?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'বিলাস নয় সুব্রত, বিশ্বাস কর। এর চেয়ে বেশি ভালো থাকবার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

চেয়ে দেখলাম ওর চেহারাও খারাপ হয়ে গেছে। পরনে একটা আধ ময়লা পাজামা। গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জির ভিতর থেকে গলার হাড় দেখা যায়। ঘরে আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছু নেই। পশ্চিম দিকে একটি দড়ির আলনা, তার ওপর আর একটা পাজামা, আধ ময়লা একটা জামা, কোঁচানো নীল পেড়ে একখানা শাড়ি, একটা সাদা সেমিজ। তার নিচে কোণের দিকে এনামেলের ছোট একটা হাঁড়ি আর খান দুই বাসন রান্নাবান্নার সাজসরঞ্জাম। কিন্তু তক্তাপোশের তলায় আরো কিছু গৃহস্থালীর আসবাব আছে। হামাগুড়ি দিয়ে তার ভিতর থেকে চায়ের সরঞ্জাম বের করল এডিথ। তারপর সরে এসে মেজের ওপর চা করতে বসল।

বললাম, 'আবার ওসব কেন?'

এডিথ বলল, 'খান। শুধু এক কাপ চা-ই তো।'

চায়ের পর্ব শেষে হলে এডিথ বলল, আমি তাহলে একটু বেরুচ্ছি। না ফেরা পর্যন্ত তুমি কিন্তু কোথাও যেয়ো না।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'কিন্তু আজ তুমি না বেরোলেই পারতে। শরীরটা যখন এত খারাপ।'

বললাম, 'কেন কি হয়েছে এডিথের?'

দুজনেই চুপ করে রইল। এডিথের দিকে তাকাতে সে লজ্জিত ভঙ্গিতে নিচু করল চোখ। এবার আমি একটু ভালো করে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম এডিথ অন্তঃস্বত্ত্বা।

একটু বাদে এডিথ বেরিয়ে গেল। 'আর একদিন আসবেন মিঃ চক্রবর্তী। অবশ্য আসবেন।'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমি মৃগাঙ্ককে বললাম, 'বরুণ বলছিল একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে নাকি--'

মৃগাঙ্ক বলল, 'এডিথের নামটা তো ওই রকমই শোনায়। কিন্তু আসলে ও খাঁটি ইণ্ডিয়ান।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম,'তোমাদের এই অপূর্ব যোগাযোগ হলো কি করে?' মৃগাঙ্ক সংক্ষেপে তখন ব্যাপারটি জানাল।

ইউরোপ থেকে ঘুরে আসবার পর বিদেশ বলে মনে হতে লাগল মৃগাঙ্কের। হাতে একটি পয়সা নেই। কোন বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখাবার জো নেই। মাস কয়েকের মধ্যে এমন দশা হোল যে মাঝে মাঝে অভুক্ত থাকতে হয়। ছবি আঁকার খেয়াল আর তখন নেই মৃগাঙ্কের। ও তখন বুঝতে পেরেছে নিজের দৌড়। বুঝতে পেরেছে ভুল পথে এসেছে। এখন কোন একটা চাকরি বাকরি পেলেই হয়। কিন্তু কোথায় সে চাকরি। এই সময় কানে গেল অদিতির কথা। সে নাকি কোন এক ফিল্ম ডিরেক্টরের মিস্ট্রেস হয়ে বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই আছে। ছোটখাট জলসা টলসায় ডাক পড়ছে মাঝে মাঝে। দুএকখানা গানের রেকর্ডও নাকি হয়েছে। এদিক থেকে চিত্রশিল্পীর চেয়ে গীত-শিল্পীর ভাগ্য ভালো। মৃগাঙ্ক একবার ভাবল যাবে নাকি ভিখারী শিব

হয়ে অন্নপূর্ণার কাছে। কিন্তু সে তো আর অন্নপূর্ণা নয়, সে উর্বশী। তার কাছে আর হাত পাতবার জো নেই। তা ছাড়া আত্মসম্মানেও বাধল মৃগাঙ্কের।

কিন্তু অন্নপূর্ণা নিজেই এসে হাজির হোল একদিন। মির্জাপুরের সেই মেসটায় পুরোন এক রুমমেটের খালি সীটে তখন অস্থায়ী ভাবে আছে মৃগাঙ্ক। খায় পাইস হোটেলে। অবশ্য যেদিন পয়সা পকেটে থাকে। একদিন দুপুর বেলায় চাকর এসে খবর দিল একটি মেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মৃগাঙ্ক বলল, 'নিয়ে এসো।'

চাকরটির পিছনে পিছনে ঘরে এসে ঢুকল এডিথ।

চাকরটি চলে যাওয়ার পর মৃগাঙ্ক বলল, 'তুমি!'

এডিথ বলল, 'হ্যাঁ মিঃ চ্যাটার্জি।'

ঘরে রুমমেটরা কেউ নেই। সবাই কাজকর্মে বেরিয়ে পড়েছে।

মৃগাঙ্ক তাকে তক্তাপোশের পাশে বসতে বলল।

'তুমি কি করে আমার খোঁজ পেলে?'

এডিথ বলল যে দূর থেকে একদিন সে মৃগাঙ্ককে দেখতে পেয়েছিল। তারপর তার এক পুরোন বন্ধুর কাছে খোঁজ খবর আর ঠিকানা সংগ্রহ করে এখানে এসেছে।

এডিথ বলল, 'আমি সবই শুনেছি মিঃ চ্যাটার্জি। আপনার চাকরি বাকরি নেই।'

মৃগাঙ্ক অদ্ভুত একটু হাসল, 'হোটেল খরচাটাও নেই পকেটে, তাও শুনেছ নিশ্চয়ই।'

এডিথ বলল, 'তাতে দুঃখ করবেন না মিঃ চ্যাটার্জি। টাকা পয়সার নিয়মই এই। কখনো থাকে কখনো থাকে না। এখন গেছে আবার হবে, আপনি ভাববেন না।'

তারপর আস্তে আস্তে আঁচলের গিঁট খুলতে লাগল এডিথ।

গিঁট খুলে বার করল একখানা নোট। দু টাকা এক টাকার নয়। একশ টাকার। 'নিন মিঃ চ্যাটার্জি।'

মৃগাঙ্ক বলল 'ওকি।'

এডিথ বলল, 'আপনার সেই নোট। আপনি তখন যথাসর্বস্ব বেচে এই টাকা দিয়েছিলেন, শত অভাব অনটনেও এ টাকা আমি খরচ করিনি। আপনার টাকা আজ নিন আপনি। না মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। সে দিন তো আমি ফিরিয়ে দেইনি। সেদিন তো আমি নিয়েছিলাম। আজ আপনিও নিন।'

সেদিন এই নোটখানার ওপর এডিথের চোখের জল পড়েছিল, আজ বুঝি মৃগাঙ্কের চোখের জলও গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মৃগাঙ্ক পড়তে দিল না। সে তো মেয়ে নয়। অন্যমনস্ক হবার জন্যে অন্য কথা পাড়ল। 'তুমি কোথায় আছ এডিথ, বিয়ে থা করেছ?'

এডিথ একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'বিয়ে তো আমার অনেক আগেই হয়ে গেছে মিঃ চ্যাটার্জি।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'তাই নাকি? কবে কোথায় কার সঙ্গে?'

চোখ নিচু করে মৃদু গলায় তিনটি প্রশ্নের কেবল একটি জবাব দিল এডিথ—'সেই কোর্টে।'

দুজনেই একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ মৃগাঙ্ক সেই তক্তাপোশ থেকে উঠে এডিথের সামনে এসে তাকে বুকে চেপে ধরল। এডিথ রুদ্ধ শ্বাসে বলল, 'ছাড়ুন, মিঃ চ্যাটার্জি, ছাড়ুন। এতো আমি চাইনি, এতো আমি চাইনে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আমি চাই এডিথ, আমি চাই।'

জানালা দিয়ে একটু হাসির শব্দ শোনা গেল। মৃগাঙ্ক সেদিকে তাকাতেই সরে গেল মেসের চাকরটি। ও বোধ হয় এতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখেছে। দেখুক—সাক্ষী থাকুক। তাদের এই গান্ধর্ব বিবাহের এই হোক একমাত্র পুরোহিত।

ডিকসন লেনে এই বাসাটা এডিথের আগে থেকেই ছিল। এখান থেকে তার কাজের জায়গা কাছে পড়ে। এ বাসা ছেড়ে দেওয়ার এখনো কারণ ঘটেনি, এখনো সামর্থ্য হয়নি মৃগাঙ্কদের।

তারপর আমি সময় পেলে মাঝে মাঝে যেতাম। খুব ঘন ঘন নয়। মাসে দুই একদিন। এডিথ তার সেই অবস্থা নিয়েই অন্য দুটি বাড়িতে আয়ার কাজ করত। ছোট ছেলেমেয়ে রাখত স্বচ্ছল গৃহস্থের। তাছাড়াও বেশি টাকার জন্যে অন্য কাজকর্ম করতে হোত। আমি বলতাম, 'এডিথ এত খাটুনি কি তোমার শরীরে কুলোবে?'

এডিথ লজ্জিত হেসে বলত,'কুলোবে মিঃ চক্রবর্তী, আমার দ্বিগুণ শক্তি বেড়ে গেছে। আপনি তো জানেন না।'

এডিথের কষ্ট দেখে মৃগাঙ্কও বসে রইল না। সেও বেরোল কাজের চেষ্টায়, কিন্তু কাজতো সব সময় চেষ্টা করলেই মেলে না।

জাত শিল্পীর দেমাক ছেড়ে ও পণ্যশিল্পেও হাত দিল। বইয়ের ওপরের মলাট, ভিতরের ইলাসট্রেশন, মাথার তেল আর দাঁতের মাজনের ছবি আঁকবার জন্যে এগিয়ে গেল।

কিন্তু ওর প্রয়োজনটাই তো সব নয়। যারা ওর হাতের কাজ দেখল তারা পছন্দ করল না, তাদের দরকারের উপযোগী বলে মনে করল না। রাগ করে মৃগাঙ্ক ফের ওর সেই দুর্বোধ্য ছবি নিয়ে বসল।

কয়েক মাস বাদে হাসপাতালে একটি মৃত মেয়ে প্রসব করে এডিথ মারা গেল। মৃত্যুর আগে পাদ্রী ডেকে সে খৃস্টানী মতে আত্মদোষ স্বীকার ক'রে গেল। কোর্টে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলেছিল এই তার সব চেয়ে বড় পাপ। সে পাপ যেন প্রভু ক্ষমা করেন। আর মৃগাঙ্ককে একটি অন্তিম ইচ্ছা জানাল এডিথ। পার্ক সার্কাসের বড় গ্রেভ ইয়ার্ডের এক কোণে তার জন্যে যেন একটু জায়গা জুটিয়ে

দেয় মৃগাঙ্ক।

জায়গা পাওয়া সহজ হোল না। চার্চ থেকে নানারকম আপত্তি উঠল। মৃগাঙ্ক ঠিক খৃস্টান নয়, যথার্থ খৃস্টানের রীতি-নীতি সে মানেনি। চার্চে যায় নি। কিন্তু তখন মানেনি, এখন মানল, তখন যায়নি, এখন গেল। তাছাড়া ধার ক'রে কিছু টাকাও এর জন্যে ব্যয় করল মৃগাঙ্ক। শেষ পর্যন্ত পাদ্রীদের হৃদয় গলল।

আমি বললাম, 'মৃগাঙ্ক, তুমি তাহ'লে এতদিনে সত্যিই খৃস্টান হলে। আস্তিক হলে। অদিতি যা করতে পারেনি, এডিথ তোমাকে তাই ক'রে গেল।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ তা করল। কিন্তু তুমি যে অর্থে বলছ সে অর্থে নয়, তুমি যে চোখে দেখছ সে চোখে নয়। সমস্ত ধর্ম আর সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি আজ একই শিল্পরূপ দেখতে পাচ্ছি সুব্রত। সেই রূপের অস্তিত্ব আমি স্বীকার করছি। শুধু এই অর্থেই আমি আস্তিক।'

এর বোধ হয় বছর খানেক কি বছর দেড়েক পরে অদিতির সঙ্গে আমার এক অদ্ভুত অবস্থায় দেখা হয়ে গেল। তার আগে থেকেই কিছু কিছু দুরবস্থার কথা আমার কানে আসছিল। বছরে পর পর দু'খানা ছবিতে মার খেয়ে নবভারত পিকচার্স তালা বন্ধ করেছে, কয়েকটা মামলা চলছে তার নামে। আর ডিরেক্টর মিঃ সেহানবীশ নানাজনের তাগিদে অস্থির হয়ে শেষ পর্যন্ত বোম্বে গেছেন সৌভাগ্যের খোজে। যাওয়ার সময় অদিতির সঙ্গে শুধু তার ঝগড়া নয়, সম্পর্কচ্ছেদও হয়ে গেছে। তিনি নাকি রাগ ক'রে বলেছেন, অদিতির মত এমন একটি অপয়া মেয়ে তিনি নাকি আর কখনো দেখেননি। তার দোষেই মিঃ সেহানবীশের সব লোকসান হয়েছে। অদিতির ওপরের ওই চামড়াটাই একটু সাদা, ভিতরে বস্তু বলে কিছু নেই। অদিতির জন্যে তিনি যত টাকা ঢেলেছেন, সবই

তাঁর জলে গেছে। ক্যামেরায় অদিতির রূপ ভালো ক'রে ধরা পড়েনি। রেকর্ডে তার গলা নাকি কান্নার মত শুনিয়েছে। কাগজওয়ালারা পঞ্চমুখে গাল দিয়েছে। দশ বছরের মধ্যে মিঃ সেহানবীশের আর কোন চান্স পাওয়ার আশা নেই।

অদিতিও রূঢ় ভাষায় জবাব দিতে ছাড়েনি। সেহানবীশ এখন অদিতির দোষ দিচ্ছে বটে, কিন্তু আসল দোষটা তার নিজের। স্যুটিং-এর সময় সে মন দিয়ে কাজ করেনি। ড্রিঙ্ক ক'রে বেশির ভাগ দিনই সে বেসামাল হয়ে রয়েছে। যেদিন মদ একটু কম পড়েছে, সেদিন নতুন তরুণী আর্টিস্টদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করেছে বেশি। অদিতির ঘাড়ে এখন দোষ চাপালে কি হবে, সব দায়িত্ব সেহানবীশের নিজের, সব দায় তার।

গল্পের শেষাংশ মৃগাঙ্কের মুখেই শুনতে পেলাম বছর দেড়েক বাদে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অদিতির সঙ্গে মৃগাঙ্কের প্রথমে দেখা হয় ধর্মতলা স্ট্রিটে জয়শ্রী সিনেমা কোম্পানির অফিসে। স্থির চিত্রে কোন আর আশা নেই দেখে মৃগাঙ্কও চলচ্চিত্রে যোগ দিয়েছে। দৃশ্যপট আঁকে, পোস্টার আঁকে। যখন যে কাজ হাতে আসে তাই করে। কিন্তু টাকা বড় একটা হাতে আসে না। জয়শ্রী কোম্পানির টাকাটা একেবারেই এল না। তাগিদ দেওয়ার জন্যে মৃগাঙ্ক গিয়ে হাজির হোল কোম্পানির অফিসে ছবি তোলার আগে, ছবি তোলার সময় অফিস ঘরে বসবার জায়গা থাকত না। কিন্তু ছবি ফ্লপ করবার পর ঘরে জায়গা আছে বসবার লোক নেই। দেয়ালে লটকানো আগেকার ছবিখানার খানকয়েক পোস্টার। মৃগাঙ্কেরই হাতের আঁকা। দক্ষিণদিকে মুখ ক'রে একটি ছোকরা একখানা শূন্য টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছে। মৃগাঙ্ক বলল, 'সুধীরবাবু, ডিরেক্টর কখন আসবেন?'

সুধীর বলল, 'বলে গেছেন তো তিনটায়। কখন আসবেন তিনিই জানেন।'

বসে খবরের কাগজও পড়ছে না, কলেজের পড়াও পড়ছে না ; আর একটি ছেলের সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছে। দুজনের সামনে দুটি চায়ের কাপ, মুখে গল্প।

প্রণবেশ এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তারপর মৃদু কিন্তু গম্ভীর স্বরে ডাকলেন—পানু, কাগজখানা নিয়ে এঘরে একটু এসো।

সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন প্রণবেশ। কিন্তু নিজের চেয়ারখানায় এসে বসতে না বসতেই দেখলেন কাগজ হাতে পানু এসে হাজির হয়েছে।

হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিলেন প্রণবেশ কিন্তু ঠিক তখনই পানুকে ছুটি দিলেন না। একটু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন,—ছেলেটি কে ?

পানু বাবার দিকে চেয়ে অসঙ্কোচে বলল,—আমার বন্ধু।

বন্ধু কথাটা নিশ্চয়ই অশ্রাব্য নয় তবু কানদুটো লালচে হয়ে উঠল প্রণবেশের। তাদের সময়ে রীতিনীতি আলাদা ছিল। কলেজে তিনিও তো পড়েছেন। কিন্তু বাবার কাছে কি কাকার কাছে কাউকে সরাসরি এভাবে 'আমার বন্ধু' বলে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন নি। ঘুরিয়ে বলেছেন,—আমাদের সঙ্গে পড়ে।

ঠাকুরদা বলতেন, 'ইয়ার বন্ধু'। বন্ধুর সঙ্গে বয়স্যের যে সম্বন্ধ আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সতের আঠের বছরের বি, এ, পঠনরত ছেলেকে পদে পদে আচরণ বিধি শেখাতেও যেন কেমন লাগে।

মনের উত্তাপকে ঠাণ্ডা হতে দিয়ে প্রণবেশ মুখে একটু হাসি টেনে বললেন,—তোমার বন্ধুরা কি অফুরন্ত ? এর আগে তো ওকে দেখি নি।

এবার ছেলের মুখে রসের ছোপ লাগল। কিন্তু সে বেশ শান্ত-

ভাবেই জবাব দিল,—সরিৎ আমাদের কলেজেই সায়েন্স নিয়ে পড়ছে। ফিজিক্সে অনার্স। খুব ভালো ছেলে।

প্রণবেশ বললেন,—ভালো হলেই ভালো। তুমি নিজেতো সায়েন্স নিতে সাহস পেলে না। দুএকজন বিজ্ঞানের ছাত্রের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় থাকা অবশ্য ভালোই। আচ্ছা যাও।

ছেলে চলে যেতে না যেতেই সুনন্দা এলেন তার পক্ষের উকিল হয়ে। স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা তুমি কী।

প্রণবেশ বললেন,—কঠিন এক দর্শনের প্রশ্ন করে বসলে। এক কথায় কী করে এর জবাব দিই। এই মুহূর্তে তো মনে হচ্ছে আমি কিছুই না।

সুনন্দা বললেন,—না ঠাট্টা নয়। ছেলেমেয়েদের বন্ধুবান্ধব দেখলেই তুমি যেন কেমন করো। তোমার না হয় কেউ নেই, কাউকে তোমার দরকারও নেই। কিন্তু তাই বলে ওদের বন্ধুবান্ধব বাড়িতে আসবে না?

প্রণবেশ বললেন,—আসবে বই কি। কিন্তু সকালে আড্ডা দিতে আসা কি ভালো।

সুনন্দা বললেন,—বাঃ রে বন্ধু আসবে তার আবার সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্তির আছে নাকি? তাছাড়া পানুদের তো সামারের ছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে। এখনো পড়ার চাপ তেমন পড়েনি। এলোই বা দুটি একটি ছেলে ওর কাছে। তবু তো এখনো ছেলে তার ছেলে বন্ধুদেরই নিয়ে আসে, মেয়ে আনে মেয়ে বন্ধুদের। আর একটু বড় হলে যখন উলটোটি হবে তখন তুমি সইবে কী করে তাই ভাবি।

প্রণবেশ বললেন,—তুমি সইতে পারলেই হল।

জানলার পাশ থেকে শীলা তাড়াতাড়ি সরে গেল। চতুর্দশী মেয়ের মুখে চাপা হাসি দেখতে পেলেন প্রণবেশ। মেয়ে এখনো

ফ্রক পরে। মিশনারী স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রী। কিন্তু সুনন্দা যে রকম দ্রুতবেগে ছেলের বান্ধবী আর মেয়ের সখী হয়ে উঠছে তাতে ওদের পেকে যেতে বেশি দেরি নেই। প্রণবেশ মনে মনে ভাবলেন কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললেন না। বয়স হলে বাক সংযমই সবচেয়ে বড় সংযম—দাম্পত্য কলহ হ্রাসের সুপরীক্ষিত পথ।

ঘর নির্জন হলে তিনি ফের টেবিলের দিকে তাকালেন। স্ট্যাণ্ডে ঠাসা বই। কিন্তু আদ্যোপান্ত খুব কমই পড়া হয়েছে। একটি বিলিতি পাবলিশিং কনসার্নে বড় মেজো বাদ দিয়ে সেজোসাহেবের পদে কাজ করেন প্রণবেশ। সেই সূত্রে বইপত্র বিনামূল্যে কি স্বল্পমূল্যে বগলদাবা করে নিয়ে আসেন বাড়িতে। কিন্তু বই যত আনেন পড়া তত হয়ে ওঠে না। জ্ঞানসিন্ধুই হোক আর রসসিন্ধুই হোক নতুন সমুদ্রে সাঁতবাবার শখ শক্তি অধ্যবসায় যেন ক্রমেই কমে আসছে। সেই পুরোন বই আর পুরোন বন্ধু। কিন্তু বন্ধু কোথায়! বন্ধু নেই। প্রণবেশ গভীর অভিমানে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এ বয়সে আর বন্ধু থাকে না।' প্রণবেশ হয়তো নিঃসহায় নয়, কিন্তু নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব।

এবার বইগুলির সামনে একটি ক্লিপে আঁটা খানকয়েক চিঠির দিকে তাকালেন প্রণবেশ। কোন চিঠিই অফিসের নয়। সবই তাঁর ব্যক্তিগত। আত্মীয়স্বজন প্রীতিভাজন স্নেহভাজনদের লেখা। কিছু চিঠির জবাব দেওয়া হয়েছে কিছুর বা হয় নি। প্রথমেই মৃগাঙ্কের লেখা চিঠিখানা চোখে পড়ল। এ চিঠির জবাব দেবার দরকার নেই। তবু চিঠিখানা ওপরেই রয়েছে। কয়েকবার পড়া চিঠিখানা আরো একবার পড়লেন প্রণবেশ।

প্রণব,

তোমার চিঠি পেয়েছি। জবাব দিতে দেরি হল। কিছু মনে কোরো না। বড় ঝামেলায় ছিলাম। সপ্তাহ খানেকের ছুটি

নিয়ে আমরা কাল কলকাতায় যাচ্ছি। উঠছি নিউ আলিপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখান থেকে তোমাদের ওল্ড শ্যামবাজার বড়ই দূর। প্রায়ই এই পাটনা থেকে কলকাতার মত। তাছাড়া আমি জরুরী কাজের এক লম্বা ফর্দ নিয়ে যাচ্ছি। কারো সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাতের ফুরসুৎ পাব না। যদি পারো ফোন কোরে একদিন চলে এসো। ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দুই-ই দিয়ে রাখলাম।

মৃগাঙ্ক

প্রণবেশের বাড়িতে ফোন না থাকলেও অফিসে আছে। সেখান থেকে একদিন তিনি ফোনে খবরও নিয়েছিলের মৃগাঙ্কের। ওকে অবশ্য পাননি। ওর স্ত্রীকেও না। কিন্তু তিনি যে ফোন করেছিলেন সে খবর নিশ্চয়ই মৃগাঙ্ক পেয়েছে। তবু সে একবার খোঁজ নেয়নি। খোঁজখবর নেবার পালা যেন শুধু প্রণবেশেরই। দেখা করবার জন্যে তিনিই বারবার ছুটবেন। জরুরী কাজ সংসারের ঝামেলা আজকাল কার না আছে? কিন্তু তাই বলে বন্ধুবান্ধবের খোঁজখবর কি কেউ নেয় না! যে এড়াতে চায় তার অজুহাতের অভাব হয় না। তবু প্রণবেশ প্রায় রোজই আশা করেছেন মৃগাঙ্ক ফোন করবে, বলবে, 'আমি আছি তুমি এসো।'

নিউ আলিপুর থেকে শ্যামবাজার দূরের পথ হতে পারে কিন্তু এসপ্লানেডে যেখানে প্রণবেশের অফিস সেখানে তো মৃগাঙ্ক একবার ইচ্ছা করলেই আসতে পারত। কিন্তু হয় প্রণবেশের কথা মৃগাঙ্কের মনে নেই, না হয় ইচ্ছা করেই সে মনে আনেনি। সে দরকারী কাজে এসেছে অদরকারের বন্ধুত্বকে সে আমল দেবে কেন? এ সংসারে শুধু ভাবের সম্পর্কের কোন মূল্য নেই। স্বার্থের ওপর, প্রয়োজনের ওপর যে সম্পর্কের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা নয় তা রঙীন বুদ্বুদের

মত। বিশুদ্ধ সাহিত্য শিল্প থাকতে পারে কিন্তু বিশুদ্ধ সম্পর্ক শিল্প বলে কোন বস্তু অসম্ভব।

তারিখ মিলিয়ে দেখলেন প্রণবেশ। মৃগাঙ্ক কলকাতায় এসেছে আজ ছ'দিন। হয়তো আজই চলে যাবে। কি দু-একদিন হাতে রেখে যদি বলে থাকে কাল পরশুও যেতে পারে। একবার দেখবেন নাকি ঢুঁ মেরে? পাঁচ মিনিটের বেশি থাকবেন না। শুধু একটিবার দেখে আসবেন, দেখা দিয়ে আসবেন। বলে আসবেন, 'তোমার যে কত টান তা দেখা গেল।'

ঘড়ি দেখলেন প্রণবেশ। আটটা বাজে। এবেলা নিউ আলিপুর গেলে আজ আর অফিস করা হয় না। একদিন ক্যাজুয়াল লীভ নিতে পারেন প্রণবেশ। ছুটি জমে আছে অনেক। আগের বছরে কটা দিন তো নষ্টই হয়ে গেল।

দাড়িটা তাড়াতাড়ি কামিয়ে নিলেন প্রণবেশ। আলমারি খুলে ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবি নিজেই বার করে নিলেন। ভেবেছিলেন স্ত্রীকে না বলেই পালাবেন, কিন্তু বেরোবার আগের মুহূর্তের মধ্যে ধরা পড়ে গেলেন।

সুনন্দা বললেন,—এ কী তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? প্রণবেশ চোরের মত কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বললেন,—এই একটু ঘুরে টুরে আসি।

সুনন্দা চোখ বড় করে বললেন,—ঘুরে টুরে আসি মানে? অফিসে যাবে না?

প্রণবেশ বললেন,—না, ভাবলাম আজ আর যাব না। ওবেলা বরং তোমাকে নিয়ে সিনেমায় যাব। অনেকদিন থিয়েটার সিনেমা কিছু দেখিনি।

সুনন্দা বললেন,—যাক আর ঘুষ দিয়ে দরকার নেই। তোমার সঙ্গে সিনেমায় আমি গেলে তো? অফিস কামাই করে কোথায় যাচ্ছ তাই বলতো?

কিন্তুস্ত্রীর কাছে নাম ফাঁস করতে সহজে রাজি হলেন না প্রণবেশ, যেন কোন গোপন অবৈধ অভিসারে বেরোচ্ছেন। বললেন,—যাচ্ছি এক জায়গায়।

সুনন্দা বললেন,—তুমি না বললে কী হবে, আমি জানি কোথায় তুমি যাচ্ছ।

—কোথায় ?

-নিশ্চয়ই মৃগাঙ্কবাবুর কাছে। কদিন ধরেই তো তাঁর নামে নালিশ চলছে। আমি তখনই বুঝেছি তুমি শেষ পর্যন্ত না গিয়ে পারবে না।

প্রণবেশ ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন,—গেলামই বা। কোন মৃগনয়নার কাছে তো আর যাচ্ছি নে।

সুনন্দা বললেন,—পারলে কি ছেড়ে দিতে ? কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু এসে অবধি একটা খবর দিলেন না। সেবার আমার অত বড় অসুখ গেল। ওঁরা তো তখন কলকাতাতেই ছিলেন। কেউ একবার খোঁজখবর নেননি।

প্রণবেশ বললেন,—ছেড়ে দাও। সবাইর কাছ থেকে কি আর সব বস্তু পাওয়া যায়।

সুনন্দা বলতে লাগলেন,—বেশ যাচ্ছ যাও। তোমার বন্ধুর কাছে তুমি যাবে আমি কথা বলবার কে ? কিন্তু আমার কোন আত্মীয়-স্বজন যদি তোমার একটু অনাদর অযত্ন করে তোমার মুখখানা কেমন হাঁড়ি হয়ে যায় তাও আমি দেখেছি।

পাছে ফের স্ত্রীকে হাঁড়ি মুখ দেখাতে হয় তাই মুখখানা ফিরিয়ে নিয়েই প্রণবেশ কোনরকমে বেরিয়ে গেলেন।

রাস্তায় নেমে খানিকদূর এগিয়ে একটি রেডিয়ো স্টোর্সে গিয়ে ঢুকলেন প্রণবেশ। রেডিয়ো মেরামতের ব্যাপারে কয়েকবার আনাগোনা করতে হয়েছে। মালিক তাঁকে চেনেন। দোকানে ঢুকে প্রণবেশ বললেন,—একটি ফোন করব।

তিনি বললেন,—বেশ তো।

প্রণবেশ ভাবলেন, ফোন করে যাওয়াই ভালো। এতদূর থেকে যাবেন অথচ গিয়ে যদি দেখা না পান পণ্ডশ্রম হবে। মৃগাঙ্ক এখনো আছে কিনা কলকাতায় তাতো তিনি জানেন না। সত্যিই এসেছে কিনা তারই বা ঠিক কি।

বুক পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে প্রণবেশ ফোন নাম্বারটা দেখে নিলেন। ফোনে নারীকণ্ঠে সাড়া পেলেন প্রণবেশ। নারীকণ্ঠ তবে মৃগাঙ্কের স্ত্রী ধরেনি। আর কেউ ধরেছেন। তাঁর কাছ থেকে খবর মিলল মৃগাঙ্ক কাল চলে যাচ্ছে। এখন অবশ্য বাড়িতে কেউ নেই। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কোন্ এক বন্ধুর বাড়িতে দেখা করতে গেছে। তবে বেশি দূর যায়নি। বলে গেছে আধঘণ্টার মধ্যে ফিরবে। কেউ এলে তাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে। প্রণবেশ জানিয়ে দিলেন তিনি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছবেন। মৃগাঙ্ক যেন দয়া করে সে সময় বাড়িতে থাকে।

কিন্তু ফোন করেই ভাবলেন,—কেন করলাম। কেন বললাম যে যাব। দেখাসাক্ষাৎ তো ও বন্ধ করে বসে নেই। শুধু প্রণবেশের সঙ্গে দেখা করবার বেলাতেই জরুরী কাজের দোহাই।

প্রণবেশ নিজেকে অবজ্ঞাত এমন কি অপমানিত মনে করলেন।

দোকানের মালিককে ফোন চার্জটা দিতেই তিনি জিভ কেটে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন,—আরে ছি ছি ছি। ওটা আপনি রেখে দিন। দয়া করে আসবেন মাঝে মাঝে। রেডিওটা চলছে তো বেশ ?

মালিকের শিষ্টাচারে প্রণবেশ মুগ্ধ হলেন। সাধারণ একজন দোকানদার। তাঁরও যে সৌজন্যটুকু আছে প্রণবেশের তিরিশ বছরের পুরোন বন্ধুর সেটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। হ্যাঁ, মৃগাঙ্কের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের বয়স তিরিশ বছরই হল। কিন্তু সেই বন্ধুত্ব আজ আর কালজয়ী নয়, কালজীর্ণ।

সারি সারি বাসগুলি অপেক্ষা করছে। অফিসের ভিড় এখনো শুরু হয়নি। একটু বাদেই হবে। কালো একটি ডবল-ডেকারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণবেশ এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন উঠবেন কি উঠবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একেবারে দোতলায় উঠে গেলেন। লম্বা চওড়া ভারি চেহারা প্রণবেশের। বয়স পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে। কিন্তু এখনো দোতলায় উঠবার উৎসাহ আছে। সামনের দিকে জানলার ধারে একটি সীট নিলেন। একটু পরিশ্রম হল অবশ্য। ভাবলেন এর মজুরী কি পোষাবে!

প্রণবেশকে দিয়ে মৃগাঙ্কের তো কোন প্রয়োজন নেই। প্রণবেশ নিজের আচরণের কথা ভেবে নিজেই একটু হাসলেন। নিজেকে ফের জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি কেন যাচ্ছি? আমি কি আমার ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছি? ও যেমন গল্প করার জন্যে সকালেই একজন বন্ধুকে জুটিয়েছে আমারও কি তেমন একজন কথা বলবার লোক না হলে চলছিল না? কিন্তু সেই বাক বিনিময় তো পাড়ায় বসেও চলত। পরিচিত লোক আশেপাশে তো অনেকেই ছিল। এমন কি তাদের কাউকে কাউকে বন্ধু বলেও মনে করা যায়। আর আজকাল বন্ধুত্ব মানে তো তাই। যে কোন একজন লোকের সঙ্গে বসে চা খাওয়া আর খানিকক্ষণ গল্প করা। তার জন্যে বিশেষ করে মৃগাঙ্ক সেনকে কেন?

তার সঙ্গে কলেজের সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে প্রায় তিরিশ বছরের আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব বলে? কিন্তু অঙ্কের হিসেবটাই কি সব? সম্পর্কের ঘনত্ব কি তার চেয়ে বড় নয়? সেই অন্তরঙ্গতা সব সময় বছর গুণে গুণে হয় না, বছরে বছরে বাড়ে না। বরং বছরে বছরে ক্ষয় পায়।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর প্রথম প্রণয়? কিন্তু প্রথম বলেই কি সবকিছু শেষ জীবন পর্যন্ত মূল্য পায়। জীবনে অমন কত হাজার হাজার প্রথমের আবির্ভাব আর তিরোভাব ঘটে তার কি কিছু

ঠিক আছে? প্রথম যদি দীর্ঘতম না হয় তাহলে তার কী এমন মূল্য থাকে?

প্রণবেশ ভাবলেন তুজন পুরোন বন্ধু শারীরিক দিক থেকে বেঁচে থাকলেও তাঁদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক বজায় থাকলেও বন্ধুত্ব অনেক আগেই অদৃশ্য হয় এমন তো যথেষ্টই দেখা যায়। তাঁদের সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে আর শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় না···? নামে যে অক্সিজেন আছে তার জোরেই তা বাঁচে।

বাসটা এসপ্লানেড ছাড়াল। মাঠের হাওয়া লাগল গায়ে। গাছপালার সবুজ দৃশ্য চোখে পড়ল প্রণবেশের। মন্দ লাগল না। অন্য দিন এই সময় কি এর একটু পরে অফিসে গিয়ে ঢোকেন। সারাদিন কাজের মধ্যে দিয়ে চলে যায়। আজ তার ব্যতিক্রম। মৃগাঙ্কের কল্যাণে আজ তিনি একটি অপ্রত্যাশিত ছুটি পেলেন। ফোনের খবর পেয়েও মৃগাঙ্ক থাকবে কিনা কে জানে। হয়তো ফের একটা জরুরী কাজের অজুহাতে বেরিয়ে যাবে। যদি যায়, যদি দেখা না হয় প্রণবেশের কোন ক্ষোভ নেই। এই উপলক্ষে তাঁর একটু বেড়িয়ে আসা তো হবে। তা ছাড়া ও পাড়ায় পরিচিত লোকের একেবারেই যে অভাব তাতো নয়। কোথাও না কোথাও গেলেই হবে। এমন কি কোন একটি অপরিচিত দোকানে চা খেয়ে ফিরতি বাসে চলে আসতেও মন্দ লাগবে না। মাঝে মাঝে এমন অর্থহীন নিরুদ্দেশ নিঃসঙ্গ ভ্রমণ শরীর মনের পক্ষে ভালো।

মৃগাঙ্ক চিরকালই ওই রকম। কাজের চেয়ে কাজের ব্যস্ততা ওর বেশি। সময় যেন ওর একেবারে মিনিটে সেকেণ্ডে গোণা। আসলে তা নয়। অনেক সময় ওরও অপচয় হয়। কিন্তু প্রণবেশের কাছে তার আসবার সময় নেই, চিঠি লেখার সময় নেই। আর প্রণবেশের বাড়ি সব সময়ই তার কাছে দূরের পাল্লা। আসলে এ দূরত্ব ভূগোলের নয়, মনের। আজই না হয় মৃগাঙ্ক পাটনায় গেছে, অল্পদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছে কিন্তু যখন অল ইণ্ডিয়া

রেডিওর ক্যালকাটা স্টেশনে ওর চাকরি ছিল, কখনো ভবানীপুরে কখনো কালীঘাটে কি চেতলায় ও বাসা করে বাস করেছে তখনো বছরে কদিনই বা মৃগাঙ্ক প্রণবেশের খোঁজ খবর নিত ? সেই সময়ের অভাব, কাজের চাপ, শরীর খারাপের অজুহাত লেগেই থাকত। প্রণবেশই বরং ফোনে খবর নিতেন, সময় পেলেই দেখা সাক্ষাৎ করতেন। করতেন বটে কিন্তু প্রতিবারই মনে হত এই একতরফা প্রতিদানহীন ভালোবাসায় কোন লাভ নেই। এতে মন সমৃদ্ধ হয় না। বরং পীড়িত হয়। মনের অস্বাস্থ্য অশান্তি বাড়ে।

প্রণবেশই বা এত অবুঝ কেন ? হৃদয় নিয়ে তাঁরই বা এত কাঙালপনা ? এত দাবি তিনিই বা ওর কাছে করতে যান কেন ? কী করে তিনি এমন নিঃসংশয় হলেন যে বন্ধুত্ব এক সময় তাঁদের মধ্যে হয়েছিল তা এখনো বেঁচে আছে ? মরা ঘোড়া দৌড়োয় না বলে তাঁর কেন এই অবুঝ হাহাকার ?

অবশ্য দৃশ্যত কোন অঘটন ঘটেনি। তাঁরা ঝগড়া করেননি, মামলা-মোকদ্দমা করেননি। কেউ কারো গুরুতর রকমের স্বার্থ হানিও করেননি। তা যেমন করেননি তেমন কেউ কারো জন্যে বড় রকমের কোন স্বার্থত্যাগ করেছেন, বৈষয়িক অবৈষয়িক কেউ কারো মহৎ কোন উপকার করেছেন এমন দৃষ্টান্তও এই তিরিশ বছরের ইতিহাসে নেই। এই তিরিশ বছর শুধু দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা আর তর্ক বিতর্কের যোগফল। আর দুটি পরিবার একই শহরে তখন বাস করত বলে দুই বউয়ের মধ্যে আলাপ পরিচয়, দিন কয়েকের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ—সামাজিক রীতিরক্ষা। আবেগের সম্পর্ক দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠেনি যদি বা তার সূত্রপাত হয়েছিল তাকে বেড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি, ফলে যা হবার হয়েছে। এক বিন্দু জলে অনন্ত ক্ষুধা মিটাবার চেষ্টা করলে যে অসম্ভব দাবি করা হয় সেই দাবি মৃগাঙ্কের কাছে করে চলেছেন প্রণবেশ। তা মিটবে কেন ?

রসা রোডের মোড়ে বাস বদলাতে হল। দ্বিতীয় বাসে একেবারে নিউ আলিপুরের মধ্যে গিয়ে নামলেন প্রণবেশ। জ্যামিতিক যান্ত্রিক শহর। কেউ কারো কোন খবর রাখে না। দু তিনটি যুবকের কাছে বাড়ির নিশানা জিজ্ঞেস করে প্রতিবারই হতাশ হলেন প্রণবেশ। কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না। উপযুক্ত জায়গাতেই এসে মাথা গুঁজেছে মৃগাঙ্ক।

শেষ পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে প্রণবেশই ওর আস্তানা বার করলেন। একটি দোতলা নতুন বাড়ির কড়া নাড়তেই একটি বারো তের বছরের ছেলে এসে দোর খুলে দাঁড়াল। না, মৃগাঙ্কের ছেলে নয়, তাকে তিনি চেনেন।

—কাকে খুঁজছেন?

—মৃগাঙ্ক আছে?

—হ্যাঁ, ওপরে বিশ্রাম করছেন। একটু আগে লেক মার্কেটে গিয়েছিলেন। আরো অনেক জায়গায় ঘুরেছেন।

প্রণবেশ মনে মনে বললেন,—তাতো ঘুরবেনই।

তারপর ছেলেটিকে একটু রূঢ়স্বরে বললেন,—বল গিয়ে প্রণবেশ দত্ত এসেছেন।

ছেলেটি বলল,—আসুন, ভিতরে এসে বসুন।

সোফা সেটে সাজানো ছোট একটি ড্রয়িং রুম। জানলায় জানলায় নীল পর্দা। বেশ নিরিবিলি জায়গা। কোথাও যেন কোন সাড়াশব্দ নেই।

একটু বাদে গেঞ্জি-গায়ে একজন ভদ্রলোক নেমে এলেন। লম্বা ছিপছিপে। ফর্সা রঙ, সুদর্শন চেহারা।

প্রণবেশকে দেখে হেসে বললেন,—আরে এই যে প্রণব। আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সামনের চেয়ারটায় বসলেন মৃগাঙ্কমোহন।

প্রণবেশ বললেন—শুধু কি ভাবছিলে? ভেবে ভেবে দিনরাত ঘুমও হচ্ছিল না এ কথাও বলো।

মৃগাঙ্ক বললেন,—ঈস তুমি যে দারুণ চটে আছ। আমার ওপর তুমি কবেই বা না চটা। তুমি চটেই আস, চটেই চলে যাও।

প্রণবেশ বললেন,—আর চটবার তুমি কোন কারণই ঘটতে দাও না। তুমি এসে একবার খোঁজও নিলে না, একটা ফোন পর্যন্ত করলে না। অথচ হাতের কাছেই তোমার ফোন ছিল।

মৃগাঙ্ক বললেন,—থাকলে কী হবে। মনটা তো আর হাতের কাছে ছিল না। শুধু কি হাত দিয়ে কোন কাজ হয়? এতদিন যে কী ছুটোছুটির মধ্যে ছিলাম তুমি তা ভাবতে পারবে না। এসেছি চাকরির ব্যাপারে। আবার বদলি বদলি রব উঠেছে। কোত্থেকে কোথায় ঠেলবে তার ঠিক কী। তাই চেষ্টা চরিত্র করছি আবার যাতে কালী কলকাত্তাওয়ালীর কোলে ফিরে আসতে পারি। কর্ম-কর্তা অবশ্য দিল্লী। তবু এখানেও দু-একজন মুরুব্বি-টুরুব্বি আছে। সেই সব সিঁড়ি ধরে ধরে ওপরে উঠতে হয়। এই নিয়েই কদিন কাটল।

প্রণবেশ বললেন,—হুঁ।

মৃগাঙ্ক হেসে বললেন,—হুঁ! বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি তো এক জায়গায় বসে সারাজীবন চাকরি করে গেলে। বদলির চাকরির যে কী সুখ তাতো আর তোমাকে টের পেতে হল না! প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম মন্দ নয়। এই উপলক্ষে নিখরচায় বেশ একটু দেশটা ঘুরে ফিরে দেখা যাবে। এখন একেবারে চোদ্দ ভুবন দেখছি। আর বোলো না। অসুবিধার চূড়ান্ত। ছেলেমেয়েগুলির পড়া-শুনোর যে কী ক্ষতি হচ্ছে তা আর বলবার নয়। একেক জায়গায় একেক মিডিয়াম। কাছাকাছি ভালো স্কুল পাওয়া যায় না। তারপর গিন্নির প্যানপ্যানানি লেগেই আছে। সব জায়গায় তার স্বাস্থ্য টেঁকে না। বাড়ি যদি বা পাওয়া গেল এটা পছন্দ তো ওটা পছন্দ নয়। আমি বলি পৃথিবীর সব জায়গায় আমার একখানা করে শ্বশুর-বাড়ি থাকলে ভালো হত। কিন্তু তা যখন নেই—।

প্রণবেশ মনে মনে ভাবলেন একেবারে পারিবারিক মানুষ হয়ে গেছে মৃগাঙ্ক। যাকে বলে পরিবার পরিবৃত। পরিবারের বাইরে আর কোন জগৎ নেই। একটু বেশি বয়সে বিয়ে করলে এমনই হয়।

মৃগাঙ্ক বললেন,—হাসছ যে!

প্রণবেশ বললেন,—এমনিই। তারপর তোমার স্ত্রীর শরীর এখন কেমন আছে। ইন্দিরা দেবীর দর্শন কি এখন পাওয়া যাবে?

মৃগাঙ্ক বললেন,—যদি ভক্ত হও পাবে বই কি। বাথরুমে ঢুকেছে দেখে এলাম। একটু অপেক্ষা করতে হবে। তা তোমার তো কোন কাজ নেই। রাত পোহালে তোমাকে তো আর বোঁচকা নিয়ে পাটনায় ছুটতে হবে না। ভালো কথা, তোমার অফিস বুঝি আজ ছুটি? এ সময় এলে কী করে?

প্রণবেশ বললেন,—কামাই করে এসেছি।

মৃগাঙ্ক বললেন,—বল কি? আমার জন্যে একেবারে কামাই করে ফেললে? বন্ধু প্রেমের জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত তুমি একটা দেখালে বটে। তাহলে তো আর কোন কথাই নেই। অন্তত কয়েক ঘণ্টা নিশ্চিন্তে দিব্যি আড্ডা দেওয়া যাবে। আমি এবেলা আর বেরোব না। কেনাকাটা প্রায় সবই সেরেছি। শ্বশুরকুলের কাছাকাছি যেখানে যিনি আছেন তাঁদের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ প্রায় শেষ। জানো সদাশয় এক ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুর গাড়িখানা পেয়েছিলাম। তাই কাজ-কর্ম সেরে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলাম। এসে শুনলাম তুমি ফোন করেছ, তুমি আসছ। ভাবলাম যাক দেখাটা তাহলে হল।

প্রণবেশ মুখ ভার করে বললেন,—হ্যাঁ, আমি এলাম তাই, দেখা করার গরজটা তো কেবল আমারই।

মৃগাঙ্ক বললেন,—ব্যাপারটা অমন একপেশে করে দেখছ কেন। তুমি এলে এও যেমন একটা মহৎ ঘটনা, আমি তোমাকে পেলাম সেও তেমনি এক তাৎপর্যময় সংঘটন।

প্রণবেশ বললেন,—মৃগাঙ্ক, তোমার ওসব কথার কায়দা রাখো। তুমি চিরকাল কথার ভোজবাজি কি তুবড়িবাজি ছুটিয়েই সব মাৎ করতে চাইলে। তাতে সব সময় মাৎ হয় না। আমি আসতে আসতে কী ভাবছিলাম জানো? আমাদের যা ছিল তা আর নেই।

সেই সুদর্শন ছেলেটি এতক্ষণে দু' কাপ চা নিয়ে এল।

মৃগাঙ্ক বললেন,—আরে শুধু চা কেন। মিষ্টিটিষ্টি কিছু নিয়ে আয়। প্রণব এতদিন পরে এল।

প্রণবেশ বাধা দিয়ে বললেন,—থাক থাক মিষ্টির আর দরকার নেই।

মৃগাঙ্ক বললেন,—একটু দরকার বোধহয় ছিল। তুমি তো একেবারে চিরতার জল মুখে করে চলে এসেছ। কিন্তু ভাই এখানে কাছাকাছি কোন দোকানপাট নেই। সেইটাই হল মহাঅসুবিধে।

প্রণবেশ বললেন,—যাক যাক, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। ফর্ম্যালিটির কোন দরকার নেই।

মৃগাঙ্ক চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন,—কিন্তু তুমি তো ফর্ম্যালিটিরই ভক্ত।

প্রণবেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন,—মোটেই নয়। মনে কোন আবেগ থাকলে প্রীতি প্রেম বলে সত্যিকারের কোন বস্তু থাকলে তা আপনিই বেরিয়ে আসে। সেটা হল ফর্ম, রূপ, প্রকাশ। কিছু না থাকলে তার কোন বালাই থাকে না।

মৃগাঙ্ক বললেন,—বাঃ চমৎকার বলেছ। একটু আগে তুমি যেন আরো কী বলছিলে। আমি মরে ভূত হয়ে গেছি। তাই না?

প্রণবেশ বললেন,—তুমি ভূত হবে কেন। তোমার আমার মধ্যে যে সম্পর্কটা ছিল সেটা ভূত হয়েছে।

মৃগাঙ্ক বললেন,—তোমার দেখবার ভুল। ভুত হয়নি, সেটা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। দেখ, সব কিছুরই একটা পরিবর্তন আছে। সেই পরিবর্তনকে না মানলে চলে না। জীবনের হাজার প্রয়োজনের কাছে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হয়।

প্রণবেশ বললেন,—পরিবর্তন তো আছেই। আমিও তো সেই কথা বলি। জীবের যেমন কৌমার, যৌবনং জরা জৈব সম্পর্কেরও তেমনি। আর জরার পরে মৃত্যু।

দুই বন্ধুর মধ্যে মহাতর্ক জমে উঠল। শুধু কয়েক মিনিটের জন্যে সেই তর্কে ছেদ পড়ল।

স্নান সেরে মৃগাঙ্কের স্ত্রী ইন্দিরা এসে সামনে দাঁড়ালেন। সুঠাম সুশ্রী চেহারা। মুখে মিষ্টি হাসি। প্রণবেশের মনে পড়ল আগে দু-একখানা চিঠিপত্র ইন্দিরা লিখত। এখন আর সে সব নেই। সুনন্দার সঙ্গে মৃগাঙ্কের সেই মধুর সৌখ্যও অবসান প্রায়। এই নিয়ম। সর্বে ক্ষয়ন্তা নিচয়াঃ।

—ভালো আছেন। সুনন্দাদি আছেন কেমন। ইন্দিরা জিজ্ঞেস করলেন।

প্রণবেশ বললেন,—এলাম বলেই তো এত খোঁজখবর। দেখা সাক্ষাতের তো নামও নেই।

ইন্দিরা বললেন,—বাঃ রে আপনারাই তো আসবেন। আমরা এলাম বিদেশ থেকে। যাবেন একবার পাটনায়। সত্যি ভেবেছিলাম সুনন্দাদির সঙ্গে একবার দেখা করে আসব। কিন্তু ঝামেলার পর ঝামেলা। তারপর ছোট ছেলেটার আবার ক'দিন সর্দি জ্বর গেল।

মৃগাঙ্ক মৃদু ধমকের সুরে বললেন,—থাক থাক। তোমার কৈফিয়ৎ একবিন্দুও প্রণবেশ বিশ্বাস করবে না। তাতে ওর মনও ভরবে না। তার চেয়ে এক কাজ করো। যাতে পেট কিছুটা ভরে তার একটা ব্যবস্থা করো। চিঁড়ে হোক, মুড়ি হোক, রুটি হোক, পাঁউরুটি হোক—

ইন্দিরা হেসে ভিতরে চলে গেলেন।

দুই বন্ধুর মধ্যে আবার তর্ক আর আলোচনা জমে উঠল। প্রণবেশও নিজের খুঁটি ছাড়েন না, মৃগাঙ্কও তাঁর নিজের কোট ছাড়তে রাজি নন। বন্ধুত্ব, প্রেম, সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, ফাঁকে

ফাঁকে দুজনেরই নারী-পুরুষের প্রসঙ্গ এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁরা না তুললেন। এমন জগাখিচুড়ি শুধু দীর্ঘকালের পরিচয়ের পটভূমি-কাতেই পাকানো যায়।

পাঁচ মিনিটের কথা ভেবে এসেছিলেন প্রণবেশ। সেখানে আড়াই ঘণ্টা কাটল। দুপুরে খেয়ে যাওয়ার জন্যে ঈষৎ পীড়াপীড়ি করলেন মৃগাঙ্ক আর তাঁর স্ত্রী।

কিন্তু প্রণবেশ বললেন,—তাতে লাভ কী। এখানে ভাতে টানাটানি পড়বে, আর সেখানে ভাত ফেলা যাবে।

মৃগাঙ্ক বললেন,—তাই তো। তাছাড়া তোমার পারিবারিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটানো অন্যায় হবে। এই বয়সে স্ত্রীর তুল্য বন্ধু নেই। সে কথা সবাইকে মানতে হয়। সব দরগায় সিন্নি দিয়ে দিয়ে যে ক্ষুদ-কুঁড়োটুকু থাকে সেইটুকু আমরা আজকাল একজন আর একজনকে দিতে পারি। তার বেশি দেওয়ার জো নেই। বুঝেছ প্রণবেশ?

মৃগাঙ্ক তাকে বাস-স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। প্রথম বাসটায় কিছুতেই উঠতে দিলেন না। হাত ধরে টেনে রেখে বললেন,—আরে যেয়ো যেয়ো। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। এর পরের বাসটায় ভিড় কম হবে।

ফলে আরো পনেরো মিনিট দেরি হল। আরো কিছুক্ষণ বাকবিনিময়। কখনো বা একটু নির্বাক হয়ে থাকা।

পরের বাসটায় উঠে বসলেন প্রণবেশ। জানলার ধার ঘেঁষে বসলেন। বাস ছেড়ে দেওয়ার সময় মৃগাঙ্কের দিকে হাসি মুখে তাকালেন। হাত উঁচু করলেন। স্মিত মুখ দেখলেন, উঁচু হাত দেখলেন।

বাস ছুটে চলল।

প্রণবেশ নিজের মনেই বললেন, 'এও বন্ধুত্ব'।

ঝড়ের পরে

গাঁয়ের একটি ছেলে পথ দেখিয়ে আনছিল। সে একেবারে ভিতরের উঠানে এনে শক্তিপদকে দাঁড় করিয়ে দিল। হাতের হোল্ডঅল আর স্যুটকেসটা নামিয়ে রাখল শক্তিপদ। চারদিকে স্তব্ধ। না, কান্নাকাটির কোন শব্দ নেই। উঠানের পশ্চিমে উত্তরে পুবে ছোট বড় খানকয়েক ঘর। টিনের চাল, বাঁখারির বেড়া, মাটির ভিত। জীর্ণ ঘরগুলি পড়ো পড়ো করছে কিন্তু পড়ছে না। তারাও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমের ঘরখানিই বড়। তার পিছনে বাঁশের ঝাড়। বিকেলের পড়ন্ত রোদ তার আগায় উঠেছে। চিকমিক করছে পাতাগুলি।

শক্তিপদ ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইয়ে একটা খবর দাও তো দেখি। বড় ছেলেটির নাম যেন কী। ঠিক মনে পড়ছে না।'

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তারাদাস। ও তারু এদিকে আয়। তোদের বাড়িতে অতিথ এসেছে।'

হাসির সময় নয় তবু একটু হাসি পেল শক্তিপদের। ছেলেটি বড় গ্রাম্য। গ্রামের ছেলে গ্রাম্য তো হবেই।

তার হাক ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে কিলবিল করে বেরিয়ে এল।

'কে? কে এসেছে রে?'

শক্তিপদ তাদের দিকে তাকাল। মেয়েগুলির মাথার চুল ঠিকই আছে। ছেলেদের মাথা ন্যাড়া। কিন্তু একী! এরই মধ্যে সব হয়ে গেল। সবে তো চারদিন।

বড় ছেলেটি—বোধ হয় বছর চোদ্দ হবে তার বয়স। সামনে এগিয়ে এল। বলল, 'কে আপনি?'

শক্তিপদ বলল, 'তুমি আমাকে আরো ছোট বয়সে একবার দেখেছ। বোধ হয় মনে নেই। আমি তোমাদের রাঙামামা। তোমার মাকে গিয়ে বল আমি এসেছি।'

তারাদাস সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে শক্তিপদর ধুলোমাখা জুতো ছুঁয়ে প্রণাম করল। তারপর উঠে একটু আগে চিনতেও পারেনি তারই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পরম অভিমানে নালিশ জানাল, 'মামা, বাবা নেই।'

ঠোঁঠ দুটি স্ফীত, চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে।

শক্তিপদ সস্নেহে তার পিঠে হাত রাখল। ছেলেটি রোগা। হাতের তালুতে হাড় ঠেকে। শক্তিপদ একটুকাল সেই হাড় কখানায় হাত বুলাল। তারপর সান্ত্বনার বদলে একটি অকিঞ্চিৎকর তথ্য তাকে শোনাল—'আমি টেলিগ্রাম পেয়ে এসেছি।'

খবর দেওয়ার জন্যে বাকি ছেলে-মেয়েগুলি ভিতরে গিয়েছিল। কিন্তু সুবর্ণ এল না।

ছেলেরা ফিরে এসে বলল, 'মা কাঁদছে। মা আসবে না।'

বছর পাঁচছয়ের একটি মেয়ে গামছাকে শাড়ির মত করে পরেছে। সে পরম বুদ্ধিমতীর মত বলল, 'মার লজ্জা করে।'

তারদাস বলল, 'মামা, আপনি ওদের সঙ্গে ভিতরে যান। আমি স্যুটকেস আর বিছানাটা তুলে আনছি।'

সামনে একফালি সরু বারান্দা। সামনের দিকটা খোলা, পিছনের দিকটা ঘেরা। কেমন যেন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মত। সেই সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠে শোনা গেল, 'কে বাবা, কে তুমি।'

প্রথমে চমকে উঠল শক্তিপদ, শিরশির করে উঠল গা। ছোট ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'কে উনি।'

কে একজন বলল, 'ঠাকুরমা। দুদিন অজ্ঞান হয়েছিলেন। এখন কথা বলছেন।'

ও। মনে পড়ল শক্তিপদর। ভগ্নীপতির আশি বছরের বৃদ্ধা মা তো এখনো বেঁচে আছেন।

শক্তিপদ নিজের পরিচয় দিল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে এগোতে সাহস পেল না।

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার কান্না শোনা গেল, 'সেই আসা এলে বাবা। কি দেখতে এলে বাবা।'

ঘরের ভিতরেও বেশ অন্ধকার। বাইরে যেটুকু রোদ ছিল এতক্ষণে তাও বোধ হয় নিঃশেষে মুছে গেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে শক্তিপদ অনুভব করল, মেঝের ওপর শোয়া অস্পষ্ট একটি নারীমূর্তির ছায়া থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

শক্তিপদ স্থির হয়ে একটুকাল দাঁড়িয়ে থেকে ভিজে চোখে ভিজে গলায় ডাকল, 'সুবর্ণ, সোনা!'

'কী দেখতে আর এলেন রাঙাদা। আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল।'

কিছু বলবার নেই। তবু কিছু বলতে হয়।

শক্তিপদ বলল, 'এর ওপর তো কারো হাত নেই বোন। সবই ভগবানের হাত।'

সঙ্গে সঙ্গে শক্তিপদের মনে হল অনেক অনেক দিন বাদে সে আজ একটি অনভ্যস্ত শব্দ উচ্চারণ করল। ভগবানে সে বিশ্বাস করে না। অন্তত হাত-পাওয়ালা ভগবানে তো নয়ই। প্রচলিত অনেক কিছুতেই সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু শোকে সান্ত্বনা প্রচলিত ভাষাতেই দিতে হয়। তবেই তো সবাইর বোধগম্য হতে পারে। আর ভাষা মানেই পৌত্তলিকের ভাষা। শব্দ মানেই রূপ। ধারণা ভাবনার রূপ।

বারান্দা থেকে বৃদ্ধা চেঁচিয়ে বললেন, 'ওরে তোরা একটা আলোটালো জ্বেলে দে। শক্তি কতক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে। শ্যামা, কোথায় গেলি শ্যামা? ঘরে সন্ধ্যে দিবি নে তোরা?'

একটি মেয়ে বলল, 'দিদি জল আনতে ঘাটে গেছে। এক্ষুণি আসবে। তুমি আর চেঁচামেচি করো না ঠামা। তোমার শরীর খারাপ করবে। আমরা আলো জ্বেলে দিচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে দুটি হ্যারিকেন জ্বেলে নিয়ে এল তারাদাস। একটি ঘরের ভিতরে এনে রাখল। আর একটি বারান্দায় ঠাকুরমার সামনে এনে রাখতে যাচ্ছিল, তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না না না, আমার আর আলোর দরকার নেই। আলোয় আমি আর কী দেখব। আমার যে সব অন্ধকার হয়ে গেছে।' একটু থেমে ফের তিনি আক্ষেপের সুরে বলতে লাগলেন, 'অসুখ নয় বিসুখ নয় সাক্ষাৎ যম এসে জ্যান্ত ছেলেটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল বাবা।'

শক্তিপদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কী! তাহলে কী হয়েছিল?'

টেলিগ্রামে শুধু মৃত্যুর খবরই ছিল আর শক্তিপদকে তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। রোগ ব্যাধির কোন উল্লেখ ছিল না। এবার মৃত্যুর কারণ আস্তে আস্তে সব শুনল শক্তিপদ। সে মৃত্যু অপঘাত মৃত্যু। তা যেমন বীভৎস তেমনি মর্মন্তুদ।

অফিসের কাজকর্ম সেরে রাত দশটার ট্রেনে স্টেশনে নেমেছিল নন্দলাল। তারপর চিরদিনের অভ্যাসমত রেল-ব্রীজের ওপর দিয়ে অন্ধকারে হেঁটে পার হয়ে আসছিল। উল্টোদিক থেকে কোথাকার এক মোটর ট্রলি এসে ওকে ধাক্কা দিয়ে নদীর মধ্যে ফেলে দেয়। ট্রলিটিও ব্রীজের ওপর কাত হয়ে পড়ে। শুধু নন্দ নয় ট্রলিরও একজন লোক সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে। আর একজন এখনও আছে হাসপাতালে। নন্দর দেহের আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

শক্তিপদ স্তব্ধ হয়ে রইল। মৃত্যু মাত্রই ভয়ঙ্কর। কিন্তু কোন কোন মৃত্যুর বীভৎসতার বোধ হয় আর তুলনা নেই। একটা কথা ভেবে শক্তিপদ শিউরে উঠল। খানিক আগে সে নিজেও বোকার

মত ওই ব্রীজের ওপর দিয়েই এসেছে। বীমগুলি বেশ ফাঁক ফাক ছিল। হেঁটে আসবার সময় বেশ ভয় ভয় করছিল শক্তিপদের। আশেপাশে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ছিল। আশ্চর্য, কিন্তু কেউ তাকে কদিন আগের দুর্ঘটনার কথা বলে সাবধান করে দেয়নি। নিচে—অনেক নিচে নদীর জল টলটল করছিল। ওপরে কি নিচে রক্তের কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। মাত্র কদিন আগের ঘটনা। কালস্রোত আর জলস্রোত একই সঙ্গে সব ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। একটু বাদে তারাদাস সামনে এসে দাঁড়াল—বলল, 'মামা বাইরে জল তুলে দিয়েছি। আসুন হাত-মুখ ধুয়ে নিন। চান করবেন তো? ইঁদারার জল আছে! ইচ্ছা করলে নদীতেও নাইতে পারেন। বাড়ির পিছনেই নদী।'

স্নান করতে পাবলেই ভালো হত। চৈত্র মাসের শেষ। এরই মধ্যে বেশ গরম পড়ে গেছে। কিন্তু অসময়ে নতুন জায়গায় এসে চান করতে সাহস পেল না শক্তিপদ। দিন কয়েক আগে ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়ে গেছে। স্নান কবাব চেয়ে হাতমুখ ধুয়ে ভিজে গামছায় গা মুছে ফেলবে সেই ভালো।

তারাদাস ফের তাড়া দিল, 'আসুন আর দেরি করবেন না। স্টিমারে ট্রেনে সারাদিন কেটেছে। কিছুই বোধ হয় খাওয়াটাওয়া হয় নি। গাড়িতে বেশ ভিড় ছিল না? পথে খুব কষ্ট হয়েছে না মামা?'

যেন মামার সঙ্গে তারাদাসের কতদিনের আলাপ।

ভাগ্নের কাছে স্বীকার করল না শক্তিপদ, কিন্তু কষ্ট হয়েছে ঠিকই। কলকাতা থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের এই গণ্ডগ্রামে পৌঁছতে চব্বিশ ঘণ্টা লেগে গেছে। দুবার গাড়ি-বদল করতে হয়েছে। ফেরিস্টিমারে পার হতে লেগেছে দেড় ঘণ্টা। হয়রানির এক শেষ।

উঠানে নামতে না নামতেই দীর্ঘাঙ্গী একটি মেয়ে এসে প্রণাম করল শক্তিপদকে। গা ধুয়ে শাড়িটাড়ি বদলে এসেছে। বয়স আঠের উনিশ হবে। শামলা রঙ।

শক্তিপদ বলল, 'তোমার নামই তো শ্যামা? আমাকে দেখেছ ছেলেবেলায়। মনে আছে?'

শ্যামা ঘাড় কাত করল।

সঙ্গে সঙ্গে বাকি যারা ছিল তারাও ঢিপ ঢিপ করে শক্তিপদের জুতোর ওপর মাথা রাখল।

সেই গামছাপরা মেয়েটি এবার বেশ পাল্টে এসেছে। তার পরনে এবার একটি পুরোন ফ্রক।

সে বলল, 'আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন না?'

তারাদাস ধমক দিয়ে বলল,'যাঃ যাঃ ভারি নামওয়ালী এসেছিস। বিরক্ত করিসনে মামাকে। বিশ্রাম করতে দে।'

শক্তিপদ মেয়েটির দিকে চেয়ে সস্নেহে বলল, 'কী নাম তোমার বল।'

'উমা।'

মেয়েটির মুখে হাসি। এতক্ষণে স্বনাম-ধন্যা হবার সুযোগ পেয়েছে সে।

তারাদাস বলল, 'বোনদের নাম শ্যামা, উমা, রাধা। ঠাকুরমার দেওয়া সব ঠাকুর-দেবতার নাম। আর আমাদের নামগুলিও তেমনি। তারাদাস হরিদাস গুরুদাস। সব সেকেলে।'

শক্তিপদ বলল, 'তাতে কী হয়েছে। তোমরা তো একালের। নামে কী এসে যায়।'

ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সঙ্গে আদরের সুরেই কথা বলল শক্তিপদ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তার মনে হল নন্দলাল বড় বেশি ডিপেণ্ডেটস রেখে গেছে। একটি ছাড়া সবাই তো অপোগণ্ড। কী যে গতি হবে এদের।

উঠানের একধারে বালতিতে জল, গামছা, একটি ঘটি। সামনে ছোট একখানি জল-চৌকিও পাতা আছে। শ্যামা হ্যারিকেনটি এনে কাছে রাখল।

চৌকির ওপর বসে ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে নিল। পা ধুলো। জুতোর ভিতর দিয়েও একগাদা ধুলো ঢুকেছে। বড্ড ধুলো এদিককার রাস্তায়। স্টেশন থেকে দেড় মাইল পথ হেঁটে এসেছে শক্তিপদ। রাস্তা ভালো নয়।

ঘরের মধ্যে সুবর্ণ এক কোণে চুপ করে বসে ছিল। তার যেন উঠবার শক্তি নেই, কথা বলবার শক্তি নেই। হ্যারিকেনের আলোয় এবার ভালো করে তাকে দেখল শক্তিপদ। দেখবার কিছু নেই। থানকাপড়ে মোড়া কখানা হাড়ের পুঁটলি। ঈস কী বুড়ীই না হয়ে পড়েছে সুবর্ণ। সামনের কয়েকটি দাঁত পড়ে গেছে,গাল ভেঙে গেছে। এত তাড়াতাড়ি এত বুড়ো হবার তো ওর কথা ছিল না। শক্তিপদের চেয়েও অন্তত পাচ ছ বছরের ছোট। শক্তিপদের এই তেতাল্লিশ চলছে। ওর তাহলে—। এই আকস্মিক মৃত্যুশোকই কি ওকে এমন করে জীর্ণ করেছে ? নাকি আরো বহুদিন আগে থেকেই ও জীর্ণ হয়ে আসছিল ? দারিদ্র্য, ব্যাধি আর অতিরিক্ত সন্তানবাহুল্য। ছটি আছে আরো গুটি চার-পাঁচ হয়ে অকালে চলে গেছে। অথচ এই বৈজ্ঞানিক যুগে—। অশিক্ষা—অশিক্ষা আর কুসংস্কারের বলি। অসহিষ্ণুভাবে মনে মনে বলল শক্তিপদ। অথচ তার এই খুড়তুতো বোনটি বেশ সুন্দরী ছিল ; বেশ সুন্দরী। ওর গায়ের রঙের জন্যেই তো নাম রাখা হয় সুবর্ণ। এখন সেই সোনা একেবারে সিসে হয়ে গেছে।

'ওরে তোরা কী ঘুটঘুট করছিস সব। শক্তিকে কিছু খেতেটেতে দে। বেচারা সেই কাল থেকে মুখ শুকিয়ে আছে।'

সুবর্ণের বুড়ী শাশুড়ী তাঁর সুড়ঙ্গশয্যা থেকে চেঁচাচ্ছেন।

তারাদাসই এখন বাড়ির বড় কর্তা। সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি ব্যস্ত হয়ো না ঠামা। সবই হচ্ছে।'

একটু বাদে শ্যামা এসে বলল, 'মামা আপনি এ ঘরে আসুন।'

পাশেই ছোট আর একখানা ঘর। মেঝেয় আসনপাতা। কাঁসার গ্লাসে জল। কানা উঁচু ছোট একটি থালায় মুড়ি, চিনি, নারকেল-কোরা।

তারাদাসের ভাই হরিদাস বলল, 'আমরা এখানে বসছি। দিদি, তুমি চা করে নিয়ে এস।'

শক্তিপদ বলল, 'কমিয়ে নাও। এত কী আর খেতে পারব।'

কিন্তু কেউ তার কথা শোনে না। শক্তিপদ জোর করে ভাগ্নে-ভাগ্নীদের হাতে কিছু কিছু গছিয়ে দিল।

খেতে খেতে শক্তিপদ জিজ্ঞেস করল, 'এত আগেই তোমাদের সব কাজটাজ হয়ে গেল?'

তারাদাস বলল, 'অপঘাত মৃত্যু যে। তাই তিনদিনের দিনই সব হল। ও বাড়ির কাকা পুরুত নিয়ে এলেন। তিনি আবার প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন।'

শক্তিপদ প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, 'প্রায়শ্চিত্ত? প্রায়শ্চিত্ত আবার কিসের? কত খরচ হয়েছে?'

তারাদাস বলল, 'কাকা সব জানেন। এখনও হিসাবপত্তর কিছু ঠিক হয়নি।'

খাবার খেয়ে শক্তিপদ চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে, মোটা সোটা প্রৌঢ় একজন ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়ালেন, 'নমস্কার। চিনতে পারেন? অনেক আগে দেখাসাক্ষাৎ হত। আমার নাম পরিতোষ দাস।'

শক্তিপদ প্রতি নমস্কার করে বলল, 'বা চিনতে পারব না কেন? চেহারা টেহারা অবশ্য একটু বদলে গেছে। আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই তো এলাম।'

পরিতোষবাবু বললেন, 'হ্যাঁ আমিই টেলিগ্রাম করেছিলাম।

চিঠিপত্তরও যেখানে যা লিখবার আমিই লিখেছি। শুনেছেন তো সব, দাদা আমার কীভাবে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে। একেবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।'

গলাটা একটু যেন ধরে গেল পরিতোষবাবুর।

তারপর ভদ্রলোক ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে লাগলেন। ছোট লাইন। দিনে একখানা গাড়ি আর রাত্রে একখানা গাড়ি যায়। গাড়ির সময় বাদ দিয়ে রেল-ব্রীজের ওপর দিয়ে সবাই চলাফেরা করে। কারো কিছু হয় না। কিন্তু সর্বনাশ যখন হবার। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'রাতিহপুরে খবর পেয়ে যখন গেলাম তখন আর কিছু ছিল না। চেনা শক্ত। লোকজন নিয়ে নিচ থেকে ওপরে তুললাম। রক্তে মাখামাখি। হাড়গোড় একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো। মাথার খুলিটা শুদ্ধ— ।'

শক্তিপদ বাধা দিয়ে বলল, 'থাক থাক। ওসব শুনে আর কী হবে।'

তবু আরো কিছু বিশদ বিবরণ শুনতে হল। নন্দলালের মৃতদেহ বাড়ি পর্যন্ত আনেন নি পরিতোষবাবু। পাছে পুলিশের হাঙ্গামা হয় তাই তখন তখনই সৎকারের ব্যবস্থা করেছেন। একেই তো যে শাস্তি হবার তা হয়েছে। তারপর যদি অস্থি ক'খানা নিয়ে পুলিশে টানাটানি করত, ডাক্তারে ছুরি ধরত তাহলে কি তা সহ্য করা যেত? বরং কিছু খরচপত্র করেও কাজটা তাড়াতাড়ি তিনি সেরে ফেলেছেন।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা পরিতোষবাবুর বাড়িতেই হল। তিনিই গরজ করে এই বন্দোবস্ত করলেন। বড় একখানা ঘরের মধ্যে পাশাপাশি খেতে বসে পরিতোষবাবু বললেন, 'ও বাড়িতে তো মশাই ডিম মাছ কিছু পেতেন না। আপনার খেতে কষ্ট হত। তিনদিনে শ্রাদ্ধ গেছে কিন্তু অশুচ তো তিরিশ দিনই। মাছ মাংস এক মাস আমিও খাব না। তবে ছেলেপুলেরা খায় খাক।'

মাছ মাংস অবশ্য শক্তিপদ নিজেও পছন্দ করে। কোন বেলায় নিরামিষ খেতে বাধ্য হলে তার পেট ভরে না। কিন্তু আজ এ বাড়িতে বসে লুকিয়ে আমিষ খেতে তার কেমন যেন রুচি হচ্ছিল না। নন্দও মাছটাছ খুব ভালোবাসত। খেতেও ভালোবাসত খাওয়াতেও ভালোবাসত। অনেক আগে পর পর কয়েক বছর এই দিনাজপুর থেকে বড় বড় সিঙ্গি আর মাগুর মাছ সে শক্তিপদের কলকাতার বাসায় পাঠাত। জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করত তখন। মাছটাছ জো[illegible]ড় করা তখন সুবিধে ছিল।

পরিতোষের বুড়ো মা এসে সামনে বসলেন। সম্পর্কে জেঠীমা হন নন্দের। তিনি সস্নেহে বললেন, 'খাও বাবা খাও। ওই মাছটুকু আবার পড়ে রইল কেন। খেয়ে ফেল। নিয়তি বাবা সবই নিয়তি। অদেষ্ট। নইলে ওই বিরিজের ওপর দিয়ে রাজ্যশুদ্ধ লোক আজন্ম চলাফেরা করে। ওই নন্দও তো কতদিন ঝড়বিষ্টির মধ্যে রাতদুপুরে বাড়ি এসেছে। খেয়া নৌকোয় পয়সা দিতে হয়। তাছাড়া কে আবার অত হাঙ্গামা করে। গাঁয়ের লোক ওই বিরিজের ওপর দিয়েই পারাপার হয়। কই কারো তো কিছু কোন দিন হল না। কিন্তু যার ভবপারের ডাক এসে যায় তাকে কি আর ধরে রাখবার জো আছে? হতে দেখেছি বাবা, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। আমরা পড়ে রইলাম আর ও চলে গেল—।'

বৃদ্ধার গলা আটকে এল। আঁচলে চোখ মুছলেন তিনি। পরিতোষবাবু বললেন, 'যাও তো তুমি, এখান থেকে উঠে যাও। ভদ্রলোক খেতে বসেছেন আর তুমি—।'

খাওয়াদাওয়ার পর হ্যারিকেন হাতে শক্তিপদকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন পরিতোষবাবু! একেবারেই এ বাড়ি ও বাড়ি। সীমানা-চিহ্ন হিসাবে গোটা ছয়েক সুপারিগাছ আছে মাঝখানে।

দু-একটা কথার পরই পরিতোষবাবু বিদায় নিলেন, 'আপনাকে

বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আজ গিয়ে শুয়ে পড়ুন। কথা-বার্তা যা আছে কাল হবে।'

শুতে যাবার আগে কী একটা কথা মনে পড়ল শক্তিপদের। পকেট থেকে একশ টাকার একখানা নোট বের করে সুবর্ণের কাছে গিয়ে তার হাতে গুঁজে দিল।

সুবর্ণ বলল, 'এ কী।'

শক্তিপদ বলল, 'রাখ, রেখে দে।'

সুবর্ণ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'টাকা দিয়ে আমি কী করব রাঙাদা।'

শক্তিপদ মনে মনে ভাবল, 'টাকায় অবশ্য মৃত্যু শোকের সান্ত্বনা নয়। কিন্তু যারা শোক করবার জন্যে বেঁচে থাকে তাদের তো নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসেই ও বস্তুর দরকার হয়।'

আসবার সময় এই টাকা আর যাতায়াতের রেল-ভাড়াটা জোগাড় করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে শক্তিপদকে। সে কথা মনে পড়ল।

তারাদাস এল হ্যারিকেন হাতে, স্মিতমুখে বলল, 'চলুন মামা, আপনাকে শোয়ার ঘর দেখিয়ে দিই।'

শক্তিপদ ওর পিছনে পিছনে চলল।

উঠান ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূব কোণে আর একখানা ছোট ঘর। ভাগ্নেভাগ্নীরা তার হোল্ডঅলটা আর খোলে নি। নিজেদের বিছানাই পেতে দিয়েছে। শীতল পাটির ওপর একজোড়া মাথার বালিস। ফর্সা ঢাকনিতে ফুলতোলা। শিয়রের কাছে একটি জানলা। আরো দুতিনটে জানলা আছে ঘরে।

খানিক দূরে ছোট এক জোড়া টেবিল চেয়ার। কিছু বইপত্র। নারকেলের দড়িতে বেড়ার সঙ্গে তক্তা বেঁধে তাক করা হয়েছে। তার ওপর অনেকগুলি পুরোন পঞ্জিকা। আর দুখানা মোটা মোটা বই। বোধহয় রামায়ণ-মহাভারত।

সেই বড়মেয়েটি চয়ারে বসে কী একখানা বইয়ের পাতা ওলটা-চ্ছিল, এবার লজ্জিতভাবে উঠে দাঁড়াল।

শক্তিপদ বলল,'এই যে শ্যামা। তোমাদের এই বাইরের ঘরখানা ত বেশ নিরিবিলি।'

শ্যামা বলল, 'হ্যাঁ, বাবা শেষের দিকে এই ঘরেই থাকতেন। রাত্রে ঘুমোতেন। ছুটি কাটাবার জন্যে এখানে চলে আসতেন। ধর্ম-গ্রন্থট্রন্থ নিয়েও বসতেন। কিন্তু বাবার কি আর পড়াশুনোর জো ছিল। ছোট ভাইবোনগুলি এসে এত উৎপাত করত! কেউ ঘাড়ের ওপর চড়ত, কেউ পিঠের ওপর উঠত। কেউ একটা পয়সার লোভে পাকা চুল তুলে দিত, কেউ বা পা টিপে দিয়ে পয়সা চাইত। ওদের জ্বালায় আমি বাবার কাছে ঘেঁষতে পারতাম না। বাবাও সবাইকে খুব ভালোবাসতেন। যেদিন ওরা নিজেরা না আসত তিনিই ওদের ডাকাডাকি করে নিয়ে আসতেন।'

তারাদাস বলল,'দিদি, মামার যা যা লাগবে সব দিয়েছিস তো?'

শ্যামা বলল, 'হ্যাঁ। জল আছে কুজোয়, গ্লাস রইল। পাখা, টর্চ সব আছে। মশারিটা চাঁদা করে রেখে গেলাম। শোয়ার সময় ফেলে নেবেন। না কি এখনই ফেলে দিয়ে যাব?'

শক্তিপদ বলল, 'না না থাক। আমিই ফেলে নিতে পারব। তোমরা যাও এবার। রাত হল।'

রাত অবশ্য দশটার বেশি হবে না। কিন্তু সারা গ্রাম এরই মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেছে। যেন রাত দুপুর।

তারাদাস তবু যায় না। একটু ইতস্তত করে বলল, 'একা একা থাকতে আপনার আবার ভয়টয় করবে না তো?'

শক্তিপদ হেসে বলল, 'ভয় কিসের?'

তারাদাস বলল, 'বাবা এই ঘরেই থাকতেন কিনা। দিনের বেলায় তেমন কিছু হয় না। রাত্রে একা একা আসতে আমার কিন্তু গা ছমছম করে।'

শ্যামা হাসি চেপে বলল, 'যাঃ ফাজিল কোথাকার। তুই আর মামা কি সমান? কোন কিছু দরকার হলে ডাকবেন আমাদের। দোরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলেই শুনতে পাব। আমার ঘুম খুব পাতলা। আর ঠাকমার তো রাত্রে ঘুমই হয় না। আজ আরো হবে না। সারা রাত ছটফট করবেন।'

শক্তিপদ বলল, 'কেন?'

শ্যামা একটু ইতস্তত করে বলল, 'আজ ঠাকুরমার আফিং আসে নি। তারুর ভুল হয়ে গেছে আনতে।'

শক্তিপদ অবাক হয়ে বলল, 'আফিং দিয়ে আবার কী করেন উনি?'

তারাদাস দিদির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'কী আবার করবেন, খান। প্রথমে খেতেন বাতের ওষুধ হিসেবে। তারপর পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে এখন আর বড় একটা ডেলা না হলে চলে না। বাবা রোজ রাগ করতেন, আবার রোজ আনতেন। মুখে বলতেন, আমি আর পারব না। বাবা তো গেলেন, এখন তার মার আফিং-এর খরচ কে জোগাবে?'

শ্যামা ধমক দিয়ে বলল, 'থাক, তোর আর বুড়োমি করতে হবে না। চল এবার, মামাকে ঘুমোতে দে।' শক্তিপদ ভাবল আশ্চর্য এই শরীরের নিয়ম। পুত্র শোকাতুরারও নেশার বস্তুটি সময় মত না পেলে চলে না।

ওরা চলে গেলে শক্তিপদ দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। মশারিটা ফেলে নিল। একটু একটু হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। সেই সঙ্গে বেলফুলের উগ্রগন্ধ। ফুল আর ফলের বাগান করবার বেশ শখ ছিল নন্দলালের।

ক্লান্ত দেহে যত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে ভেবেছিল তা এল না। শক্তিপদ একটা সিগারেট ধরাল। সত্যিই একজন মরা মানুষের খাটের ওপর শুয়ে আছে সে। সেই মানুষটি আর নেই। কিন্তু

তার ব্যবহারের অনেক জিনিসপত্রই পড়ে আছে। এই খাট-মশারি, টেবিল-চেয়ার, ঘরের কোণে ওই পুরোন গড়গড়াটা—সবই রয়েছে। প্রাণের চেয়ে জড়বস্তু অনেক দীর্ঘজীবী আর টেঁকসই।

এত কোমল পেলব প্রাণের আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর, তিরোভাবও তেমনি। শক্তিপদ ভাবল বড় অদ্ভুত বস্তু এই মৃত্যু। মানুষ এক হিসাবে তাকে নিয়ে ঘর করে তবু তার কথা তার মনে পড়ে না। না পড়াই ভালো। মৃত্যুকে না ভুললে জীবনকে ভুলতে হয়। শক্তিপদও ভাবে না মৃত্যুর কথা। ভাববে কি। কলকাতায় কি আর তার মরবার সময় আছে। দুটো অফিস। একটা হোলটাইম, আর একটা পার্টটাইম। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। ছেলেমেয়ে দুটি ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের মা অবশ্য ঘুমোয় না। জেগে জেগে বই পড়ে, কি সেলাই করে। শক্তিপদ টেবিল চেয়ারে স্ত্রীর মুখোমুখি বসে খায়। খেতে খেতে গল্পটল্প হয়। কোনদিন বা সংসারের অভাব অনটনের ফিরিস্তি ওঠে। তারপর মহা নিদ্রার কথা নিশ্চয়ই শক্তিপদের মনে হয় না। তখন যৌথ নিদ্রারই আয়োজন চলে।

কিন্তু মনে না পড়লেও, মনে না করলেও মৃত্যু আছে। তার মুখোমুখি মানুষকে দাঁড়াতেই হয়। নিজের মৃত্যুর আগে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে হয়। কী এই মৃত্যু! মৃত্যু মানে সম্পূর্ণ অবলুপ্তি। হ্যাঁ, এ ছাড়া মৃত্যুর আর কোন অর্থ আছে বলে শক্তিপদ যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে ভাবতে পারে না। আগে আগে ছেলেবেলায় পারত। তখন যুক্তিটুক্তি কিছু ছিল না। তখন বাপ-দাদার মুখে যা শুনত তাই বিশ্বাস করত। জন্মজন্মান্তর দেহহীন আত্মার অস্তিত্ব আরো কত রূপকথায় বিশ্বাস ছিল। নিজেও আকাশের দিকে তাকিয়ে কত দেবরাজ্য স্বর্গরাজ্য দেখত, কত কী কল্পনা করত। তারপর বিজ্ঞান এসে সেই কল্পনার পাখা কেটে নিয়েছে। আশ্চর্য যে বিজ্ঞানের দোহাই সে দেয় সেই বিজ্ঞান কিন্তু

সে একপাতাও পড়েনি। সে আর্টসের ছাত্র। যা পড়েছে সব কবিতা গল্প উপন্যাস। ভেবেছিল ঘরে বসে বিজ্ঞানের পুঁথির দু-একটা লৌকিক সংস্করণ উলটে পালটে দেখবে। তাও হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সেই গল্প উপন্যাসের ভিতর দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে একালের বিজ্ঞান দর্শনের হাওয়া ভেসে এসেছে। এই সামাজিক হাওয়াটাই সব। তাতেই মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়।

পরিতোষবাবুর মা বলছিলেন, অদৃষ্ট নিয়তি। শক্তিপদ কোন কথা বলে নি। শক্তিপদ যত দূর পারে এই সব অনাধুনিক অবৈজ্ঞানিক শব্দগুলিকে এড়িয়ে যায়। না এড়ালেই গড়াতে হবে। কিছুতেই গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে পথ মিলবে না। তার চেয়ে এই দৃশ্যমান বস্তুজগৎকেই সর্বস্ব বলে ধরে নিয়ে ন্যায়নীতি প্রীতি প্রেম ভালোবাসা নিয়ে ঘর করা ঢের ভালো। যার যে রকম বিশ্বাসই থাকুক না দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষ তাই করে। এই বস্তুজগৎকেই সর্বস্ব মনে করে। এক অর্থে সবাই বস্তুতান্ত্রিক।

তবু মাঝে মাঝে এই ধরনের একেকটা ঘটনা চমকে দেয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। সত্যি নন্দলালের এমন করে মরবার কী অর্থ হয়? অদৃষ্ট নিয়তি পূর্বজন্মের কর্মফলের শরণ না নিয়েও এর বাস্তব ব্যাখ্যা অবশ্য দেওয়া যায়। যুক্তির সঙ্গে যুক্তির শিকল গাঁথা যায়। কার্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় অসাধ্য হয় না। কিন্তু যা ঘটে গেল ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে ফের অঘটিত করা যায় না। চরম অমঙ্গল যা ঘটবার তাতো ঘটলই। অমঙ্গলের অস্তিত্ব মানতেই হয়। তা যেমন বাইরের জগতে নৈসর্গিক অনৈসর্গিক ঘটনার মধ্যে আছে তেমনি মানুষের ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যে আছে ষড়রিপুর আকারে। সেই রিপু কখনো প্রচ্ছন্ন ক্ষীণ, কখনো প্রবল। কে যেন বলেছিলেন মঙ্গল আছে বলেই অমঙ্গল আছে। এ ব্যাখ্যা

শক্তিপদের মনঃপুত হয়নি। কেন, শুধু মঙ্গল থাকলে কী ক্ষতি ছিল? আসলে জড় প্রকৃতিতে মঙ্গলও নেই অমঙ্গলও নেই। সে তার নিজের নিয়মে কি অনিয়মে চলে। মানুষ, শুধু মানুষ কেন, সমস্ত জীবজগৎ তার ইষ্ট আর অনিষ্টের ব্যাখ্যা সেই প্রকৃতির ভিতর থেকে খুঁজে নেয়।

তত্ত্ব থেকে ঘুরে ঘুরে ফের নন্দের কথা মনে এল শক্তিপদের।

সত্যি কীভাবেই না নন্দ মারা গেল। ও নাকি মাছের তরকারিটা রাত্রে এসে খাবে বলে রেখে গিয়েছিল। সে আশা তার আর মেটেনি। জীবন যে অনিশ্চিত তাতে সন্দেহ কী। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক জীবন এখনো পদ্মপত্রে নীর। আর চিরকাল হয়তো তাই থাকবে। কিন্তু তাই বলে মানুষ কি তার নিশ্চিত বুদ্ধির গর্ব ছাড়বে? দীপের পর দীপ জ্বেলে সব অন্ধকার দূর করবার, সব রহস্য ভেদ করবার স্পর্ধা কি তার কখনো শেষ হবে?

ঘুম ভাঙল পাখির ডাকের শব্দে। হয়তো ছেলেমেয়েদের কোলাহলও তার সঙ্গে মিশে ছিল। ভারি ভালো লাগতে লাগল শক্তিপদের। শান্তস্নিগ্ধ ভোরের হাওয়া বেশ উপভোগ্য। কান জুড়ানো স্তব্ধতা, চোখ জুড়ানো সবুজ দৃশ্য। চারদিকে গাছপালা আমজাম কাঁঠালের বাগান। জানালা দিয়ে একটা বড় পুকুর দেখা যায়। বাঁধানো ঘাটে কারা এরই মধ্যে নাইতে নেমেছে। ওপারে পোস্ট অফিস। ছোট একটা পাকাবাড়ি তৈরি হচ্ছে পাশে। সামনে একখানা বেঞ্চ পাতা। তার ওপর জনতিনেক ভদ্রলোক বসে কী আলাপ করছেন। ছবির মত দৃশ্য। বেশ লাগতে লাগল শক্তিপদের। আশ্চর্য, লোকগন্ধ হয়ে সে যেন একটি শোকার্ত পরিবারের মধ্যে এসে পড়েনি। এরই মধ্যে নন্দলালের অপমৃত্যুর কথা সে ভুলতে বসেছে। লজ্জিত হল শক্তিপদ। জীবন এইরকমই নিষ্ঠুর। মৃত্যুকে সে শিশুর মত ক্ষণে ক্ষণে ভোলে। নতুন খেলনা পেয়ে

হাসে। জানে না মৃত্যুর হাতে সেও শিশুর খেলনা ছাড়া কিছু নয়।

দোর খুলে বেরোতেই দেখল তারাদাস আর তার ভাই হরিদাস দাঁড়িয়ে। হরি তার দাদার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। সামনের একটা দাঁত পোকায় খাওয়া। কোথেকে নিমডালের একটা দাঁতন নিয়ে এসেছে। স্যুটকেসের মধ্যে অবশ্য শক্তিপদের পেস্ট আর টুথব্রাশ আছে। অঞ্জলি সব গুছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ভাগ্নেকে খুশি করবার জন্যে শক্তিপদ দাঁতনটাই হরিদাসের কাছে থেকে চেয়ে নিল।

তারাদাস বলল, 'দিদি জিজ্ঞেস করছিল আপনি কি মুখটুক ধোয়ার আগে এক কাপ চা খেয়ে নেবেন?'

শক্তিপদ বলল, 'না, পরেই খাব।'

আর একটু পরে ওদের বড়ঘরের বারান্দায় জলচৌকির ওপর বসে চা খেতে খেতে ভাগ্নেভাগ্নীদের পড়াশুনো সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিল শক্তিপদ। শ্যামা আর পড়ে না।

সেকেণ্ড থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়ে ছেড়ে দিয়েছে। কি দিতে বাধ্য হয়েছে। গাঁয়ের স্কুলে মেয়েদের আর বেশি পড়বার ব্যবস্থা নেই। ভেবেছিল বাড়িতে পড়ে স্কুল ফাইনালটা দেবে। আর হয়ে ওঠে নি। তারাদাস যায় শহরের স্কুলে। মান্থলি টিকেটে যাতায়াত করে। এত বড় পরিবারের একমাত্র সম্বল ছিল নন্দলালের সোয়া শ টাকা মাইনের চাকরি। তবু ওরই মধ্যে দু'একখানা করে জমি সে রেখেছে। ফসল যে বছর ভালো হয় টেনেটুনে ছ'সাত মাস যায়। আর কোন সম্পদ নেই। লাইফ ইনসিওরেন্স হাজার দেড়েক টাকার করেছিল। অনেক আগেই ল্যাপসও হয়ে গেছে। আর যা আছে সব দেনা। জমির খাজনা বাকি, দোকানপাটে বাকি। একজন গৃহস্থকে কতরকম ফিকির ফন্দী করেই তো সংসার চালাতে হয়। ধার কর্জ কার না আছে।

নন্দর মা বললেন, 'সব কি আর নগদে চলত বাবা? সেই রকম রোজগার কি আর ছিল? তবু যতক্ষণ পেরেছে জ্ঞাতিকুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব কারো কাছে হাত পাতে নি। নিজের জামা ছিঁড়ে গেছে, পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, পায়ের জুতায় তালি পড়েছে। তবু হাত পাতেনি। আমি একেক সময় রাগ করেছি। তুই কি একটা পিশাচ? এই ভাবে মানুষ আফিস আদালত করে? ছেলে আমার হেসে বলেছে—আমাকে যারা চেনে তারা এতেই চিনবে মা।'

একটু চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কিছুকাল ধরে মেয়ের বিয়ের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। কোথাও কিছু পুঁজিপাটা তো ছিল না। কী করে বিয়ে দিত সেই জানে। মাঝে মাঝে একেক দল এসে মেয়ে দেখে যেত। চণ্ডীপুরের দত্তরা পছন্দও করে গিয়েছিল। ছেলেটি লেখাপড়া জানে। রেজিস্ট্রি অফিসে কাজ করে। দেনাপাওনা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। এখন কি আর কিছু হবে? সব কথা শেষ হয়ে গেছে বাবা।'

বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই শ্যামা সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। শক্তিপদ চুপ করে রইল। সঙ্গে সঙ্গেই কাউকে সে কোন ভরসা দিতে পারল না। তার অনেক দায়। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। বুড়ো মা আছেন, ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ আছে। টিউটরের মাইনে গুনতে হয় পঞ্চাশ টাকা। চড়া বাড়ি ভাড়া। তাছাড়া লোক লৌকিকতা শিষ্টতা ভদ্রতা, নাগরিকতার মাশুল কি কম জোগাতে হয় নাকি?

একথা ওকথার পর শক্তিপদ বলল, 'আমায় আজ দুপুরের গাড়ি-তেই চলে যেতে হবে।'

সবাই স্তম্ভিত। এও যেন আকস্মিক দুর্ঘটনা।

নন্দের মা বললেন, 'সে কি আজই চলে যাবে বাবা। কোন কথাই তো হল না। কিছুই তো তোমাকে বলতে পারলাম না।'

শক্তিপদ বলল, 'যেতেই হবে মাউইমা। পরের চাকরি। দুদিনের বেশি ছুটি নিয়ে আসতে পারিনি। ফার্মের সব জরুরি কাজ কর্ম পড়ে আছে। পরে আর এক সময় আসব।'

তিনি বললেন, 'এসো বাবা। কাজের ক্ষতি করে—কী আর বলব। সেও বাবা আফিস কোনদিন কামাই করেনি। রোগ ব্যাধি নিয়েও ছুটেছে। বলত, মা আর কোন বিদ্যে তো নেই। লোকে যদি বুঝতে পারে আমার যা সাধ্য তা আমি করেছি, কাজে আমি ফাঁকি দিইনি—লোকে যদি সে কথা বিশ্বাস করে সেই আমার পুঁজি!'

শেভ করবার জিনিসপত্র স্যুটকেস থেকে বার করে নেবে বলে সেই ছোট ঘরখানায় ফের ঢুকল শক্তিপদ। পায়ে পায়ে এল শ্যামা। বলল, 'মামা, দিন আমি সব বার করে দিচ্ছি। আপনি এখানে বসেই শেভ করুন না। আমি জল এনে দিচ্ছি।'

বাটিতে করে জল নিয়ে এল শ্যামা। শক্তিপদের মনে পড়ল বিয়ের আগে অল্প বয়সে সুবর্ণও এমনি ফাইফরমায়েস খাটত, টেবিল গুছিয়ে দিত, বিছানা ঝেড়ে দিত, ভারী বাধ্য ছিল সুবর্ণ শক্তিপদের। আজ সে অসুস্থ অশক্ত। রোগে শোকে বিছানা নিয়েছে। তার জায়গায় দাঁড়িয়েছে তার মেয়ে। রূপটা তেমন পায় নি, রংটা তেমন পায় নি। তবে মায়ের মুখের আদলের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে।

শ্যামা ডাকল, 'মামা!'

শক্তিপদ বলল, 'কিছু বলবে? বল না।'

শ্যামা মুখ নিচু করে বলল, 'আপনি কিন্তু ঠামার ওসব কথায় কান দেবেন না।'

'কোন্ সব কথায়?'

শ্যামা মুখ নিচু করে রইল। একটু কি লজ্জার ছোপ পড়েছে ওর মুখে?

শক্তিপদ এবার বুঝল। ব্রাশ দিয়ে গালে সাবানের ফেনা তুলতে তুলতে হেসে বলল, 'ও।'

শ্যামা বলতে লাগল, 'আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দেবেন মামা। কলকাতা কত বড় শহর, সেখানে কত রকমের কাজ—।'

শক্তিপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা। সে সব পরে হবে। তুমি ভেব না।'

ভাবল শহর বড় হলেও কাজ বড় সুলভ নয়।

মুখ ধুয়ে উঠতে না উঠতে পরিতোষবাবু এলেন,'কী মশাই ঘুমটুম হল? আপনি নাকি আজই চলে যাচ্ছেন, সে কি কথা। আপনারা কলকাতার লোক বাইরে এলেই ছটফট করেন। আমাদের আবার কলকাতায় গেলে মন টেঁকে না। তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে কনস্টি-পেশন।'

শক্তিপদ হেসে বলল, 'যা বলেছেন। কলকাতার সঙ্গে কনস্টি-পেশনের কুটুম্বিতা আছে।'

পরিতোষবাবু বললেন, 'চলুন ওই পোস্ট অফিসের দিকটায়। ওটা আমাদের গাঁয়ের সদর। ওখানে নীরদবাবু আছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব চলুন। নন্দদাকে খুব ভালোবাসতেন নীরদ-বাবু।'

পরিতোষের সঙ্গে পুকুরের ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল শক্তিপদ। তিনি দেখাতে দেখাতে চললেন, 'ওইটা পোস্ট অফিস। ওর পাশে লাইব্রেরী বিল্ডিং হচ্ছে। গবর্নমেণ্ট থেকে গ্রাণ্ট পেয়েছি আমরা। উত্তর দিকে ওই যে টিনের ঘরগুলি দেখছেন ওটা স্কুল। অনেকদিনের পুরোন।'

বেঞ্চে কয়েকজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। সব চেয়ে বয়স যাঁর, টাকটাও বড়,খদ্দরের ফতুয়া গায়ে, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিতোষ-বাবু আলাপ করিয়ে দিলেন।

'নীরদরঞ্জন চৌধুরী। এখানকার জমিদার। আর ইনি শক্তিপদ সরকার। নন্দদার সম্বন্ধী।'

নীরদবাবু বললেন, 'আরে ছেড়ে দাও ওসব। সেই রামও নেই সেই অযোধ্যাও নেই।'

শক্তিপদ লক্ষ্য করল খানিক দূরে গাছ-পালার আড়ালে একটি জীর্ণ প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে। ফাটল দিয়ে বটের চারা উঠেছে।

পরিতোষবাবু বললেন, 'পূর্ববঙ্গ থেকে প্রথমে আমরা এঁদের আশ্রয়েই এখানে আসি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। সে সব তো পূর্ব-জন্মের কথা।'

পরিতোষবাবু বললেন, 'নন্দদাকে উনি খুব ভালোবাসতেন।'

নীরদবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, একটি লোক ছিল বটে। গ্রামে তার শত্রু ছিল না।'

বেঞ্চে আরো যে তিনজন বসেছিলেন তাঁরাও সেই রায় দিলেন। নন্দের সঙ্গে কারো ঝগড়া বিবাদ ছিল না। ছেলেবুড়ো সবাইর সঙ্গে সে হেসে কথা বলত। কোন-রকম দলাদলির মধ্যে যেত না। বরং দলাদলি মেটাতেই চেষ্টা করত। অবস্থা ভালো ছিল না। কিন্তু বাড়িতে গেলে এক কাপ চা না হলে একটা পান কি এক ছিলিম তামাক কি নিদেনপক্ষে একটি বিড়ি না নিয়ে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত না।

শক্তিপদ ভাবল, 'এর চেয়ে নন্দ আর বেশি কি পেতে পারত। এই তো যথেষ্ট। মরণশীল মানুষের এইটুকুই অমরত্ব। মৃত্যুর পর দু'এক প্রহর ধরে পাড়াপড়শীর মুখে মুখে শুধু এই সুনামটুকুর ধ্বনি-প্রতিধ্বনিই আমাদের মত সাধারণ মানুষের আকাশ ছোঁয়া মনুমেণ্ট। মরবার পর যে ক'জন বন্ধু এই দেহটাকে কাঁধে তুলে কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যাবে তারা যেন বলতে পারে লোকটা কারো ক্ষতি করে নি,

লোকটা চোর ছিল না, ডাকাত ছিল না, বদমাস ছিল না— লোকটা একেবারে মন্দ ছিল না।'

শক্তিপদ বলল, 'ছেলেমেয়েগুলিকে দেখবেন। ওদের তো আর কেউ নেই। আপনারাই সহায় সম্বল।'

নীরদবাবু বললেন, 'মানুষের কতটুকু শক্তি শক্তিবাবু। যিনি দেখবার তিনিই দেখবেন। ভগবান দেখবেন।'

তিনি উঁচুতে আঙুল তুললেন।

শক্তিপদ ভাবল, আবার ভগবান। এই শব্দটার সাহায্যেই কাল সে বোনকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। ইনিও আজ এই শব্দের সাহায্য নিলেন। এই শব্দের অর্থ তাদের দুজনের কাছে নিশ্চয়ই বিভিন্ন ও ব্যঞ্জনা আলাদা। তা হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। হঠাৎ এক অদ্ভুত সহনশীলতায় শক্তিপদের মন ভরে উঠল। কোন কোন সময় কোন কোন ক্ষেত্রে এসে মানা না মানা সব সমান হয়ে যায়। দেখতে হবে মানুষ মানুষকে মানল কিনা, মানুষকে ভালো বাসল কিনা। তারপর আর কী মানল না মানল, আর কী জানল না জানল আর কাকে বিশ্বাস করল না করল—সব তুচ্ছ।

নীরদবাবু কথা দিলেন নন্দের চাষের জমিগুলি কোথায় কী অবস্থায় আছে তিনি খোঁজ খবর নেবেন। রেল কোম্পানির কাছে একটা ক্ষতিপূরণের আবেদনের কথাও উঠল। তবে কোন সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। রেলপুলের ওপর দিয়ে যাতায়াত তো আসলে বেআইনী।

শেষে বললেন, 'ভাববেন না। যার যা সাধ্য সবাই সেটুকু নন্দের জন্যে করবে। নিনাইয়ার শতেক নাও।'

কিন্তু অত বিশ্বাসের জোর শক্তিপদের মনে কোথায়? নন্দ যাদের রেখে গেছে সংসার সমুদ্রে শত তরণীর ভরসা তাদের সামান্য। শক্তমত নিশ্ছিদ্র একটি তরণী পেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।

বেলা এগারোটার গাড়ি যখন ধরতেই হবে আগে থেকেই তৈরি হওয়া ভালো। একটু বেলা হলে গামছা কাঁধে নদীতে স্নান করতে গেল শক্তিপদ। সঙ্গে সঙ্গে চলল ভাগ্নেভাগ্নীর দল। মামা খানিকবাদেই চলে যাবে শুনে তারা আর কেউ কাছ ছাড়া হচ্ছে না, সব সময়েই পাছে পাছে আছে।

বাড়ির পিছনেই নদী। নদী নয় নদ। নাম নাগর।

এই রসের নামটি ওর কে রেখেছে কে জানে।

জলে নামল শক্তিপদ। এই গ্রীষ্মের সময় সামান্যই জল আছে। এই ঘাট থেকেও উত্তর দিকে তাকালে সেই ব্রীজটিকে দেখা যায়। ছোট্ট নদীর ওপর ছোট্ট অখ্যাত এক রেল ব্রীজ। কদিন আগে একজনের জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে সেতু রচনা করে দিয়েছে।

মামার সঙ্গে নাইবে বলে তারাদাস হরিদাস দুজনেই তেল মেখে জলে নেমেছে। সাবান এনেছে সঙ্গে।

হরিদাস বলল, 'দাদা, তুই তো সব করছিস। সাবানটা আমার হাতে দেনা আমি মামার পিঠে মাখিয়ে দিই।'

শক্তিপদ বলল, 'হ্যা হরিই দিক।'

হরি খুশি হয়ে সাবান মাখাতে শুরু করল। নিজের কোমল চওড়া পিঠে পাখির পালকের মত দুটি কোমল করতলের স্পর্শ অনুভব করতে লাগল শক্তিপদ।

তারাদাস বলল, 'জানেন মামা বাবা বাঁচবার জন্যে খুব চেষ্টা করেছিলেন। এপারে মাঝিমাল্লারা যারা ছিল তাদের কাছে শুনেছি বাবা অন্ধকারে বসে বসে আসছিলেন। অন্য দিন টচটা থাকে। সেদিন ছিল না। সন্ধ্যাবেলায় আমি যখন এলাম বললেন, তুই নিয়ে যা। দূর থেকে ট্রলিটা দেখতে পেয়ে বাবা প্রথমে ছাতা ফেলে দিয়েছিলেন, তারপর জুতো জোড়া, তারপর নিজে নদীর মধ্যে লাফিয়ে পড়বেন আর সময় পেলেন না।'

মৃত্যুর সঙ্গে মানুষ তো ওইভাবেই লড়ে। আর শেষপর্যন্ত

হারে। শক্তিপদ ভাবল, মৃত্যুভয় সাধারণ মানুষের কাছে একান্ত স্বাভাবিক। কারণ মৃত্যু চিররহস্যে আচ্ছন্ন। জন্মও তাই। যতদিন না বিজ্ঞান জন্মমৃত্যুর মুখের ওপর থেকে এই দুটি কালো পর্দা তুলে ফেলতে পারবে ততদিন থিয়োলজি আর মেটাফিজিকসের রাজত্ব অব্যাহত চলবে। কিন্তু এই দুই রহস্যের সমাধান হলেও মানুষ হয়তো আরও দুরূহতর কোন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। যার মাথা আছে তারই মাথা ব্যথার দরকার হয়।

স্নান শেষ হল। খাওয়াদাওয়াও শেষ হল। আজ ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সঙ্গে বসে নিরামিষই খেল শক্তিপদ। পরিবেশন করতে লাগল শ্যামা। রোগা শরীর নিয়ে সুবর্ণ এসে বসল সামনে।

সুবর্ণ বলল, 'সবই তো দেখে গেলেন। বউদিকে বলবেন। আমি আর কী বলব। বলবার কোন শক্তি আমার আর নেই—আমার সব শেষ হয়ে গেছে।'

খেয়ে উঠে একটু বিশ্রাম করল শক্তিপদ। ট্রেনের এখনও দেরি আছে।

তারাপদ বলল, 'তাড়াহুড়ো করবেন না। আমরা আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দেব, গাড়িতে তুলে দেব।'

হঠাৎ সুবর্ণ উঠে গিয়ে কাগজে মোড়া কি একটা জিনিস নিয়ে এল। সেখানে আর কেউ ছিল না।

শক্তিপদ বলল, 'ওটা কী সুবর্ণ।'

সুবর্ণ লজ্জিতভাবে একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর মুখ নামিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ওঁর একটা ফটো। ভালো ফটো তো ঘরে নেই। এটা অনেকদিনের আগের তোলা। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় নিয়ে যদি—'

শক্তিপদ বলল, 'নিশ্চয়ই। আমি ভালো স্টুডিয়ো থেকে এনলার্জ করে এনে পাঠিয়ে দেব।'

সুবর্ণ সরে গেলে শক্তিপদ কাগজটা খুলে দেখে নিল ফটোখানা। বাহান্ন বছরে মারা গেল নন্দলাল। এ ফটো অনেক আগের তোলা। প্রথম যৌবনের। এখন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। লম্বাটে ধরনের মুখ। নাক চোখও বেশ বড় বড়। মুখের মিষ্টি হাসিটুকু যেন এখনো চেনা যায়। ভারি ভালোবাসত স্ত্রীকে। খুব আদর যত্ন করত। শক্তিপদের এই বোকাটে বোনটির মধ্যে কী যে এক অপূর্ব রহস্য আবিষ্কার করেছিল নন্দলাল তা সেই জানে। কলেজ জীবনে এও এক বিস্ময় ছিল শক্তিপদের কাছে। এসব নিয়ে হাসি ঠাট্টাও কম করেনি। কিন্তু যতদূর জানে শক্তিপদ মোটামুটি ওদের দাম্পত্য জীবন সুখেরই ছিল। দারিদ্র্যে অভাব অনটনে দুঃখে শোকে তা জীর্ণ হয়নি। বলা যেতে পারে সুখী হওয়া ছাড়া ওদের কোন উপায় ছিল না। তবু যে যার পথে যে যার ধরনে সুখই তো মানুষ খোঁজে আর সেই সুখের তোরণে পৌঁছবার আগে সবাইকেই বহু দুঃখের দরজা পার হয়ে যেতে হয়।

যাত্রার আয়োজন বাঁধা ছাঁদা চলতে লাগল। প্রণাম আর আশীর্বাদের পর্ব শেষ হল। পথ খরচাটা আছে কিনা দেখে নিয়ে পাঁচটা টাকা শক্তিপদ শ্যামার হাতে গুঁজে দিল, 'ভাইবোনদের মিষ্টি কিনে দিয়ো।'

শ্যামা আপত্তি করে বলল, 'না না না, আপনার হয়তো শেষে টানাটানি পড়বে। ও আমি নেব না

কিন্তু শ্যামাকে নিতেই হল।

ততক্ষণে তারাদাস আর হরিদাস দুজনে দুই ন্যাড়া মাথায় শক্তিপদের স্যুটকেস হোল্ডঅল তুলে নিয়েছে।

শক্তিপদ বলল, 'ওকি আমার কাছে একটা দাও, তোমরা পারবে কেন?'

হরিদাস বলল, 'খুব পারব। আমরা এমন কত নিই।'

সুবর্ণের শাশুড়ীর কাছ থেকে বিদায় নিল শক্তিপদ, বলল, 'চলি মাঐমা।'

বৃদ্ধা ছল ছল চোখে বললেন, 'এসো বাবা, আবার এসো,—মনে রেখো ওদের কথা।'

বাঁখারির বেড়া দিয়ে বাড়ির সামনের দিকটা ঘেরা। সুবর্ণ সেই বেড়ার ধার পর্যন্ত এল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'রাঙাদা একটা কথা।'

শক্তিপদ ফিরে তাকাল, 'কী কথা সোনা।'

সুবর্ণ বলল, 'দেখবেন ওরা যেন ভেসে না যায়, ওরা যেন মরে না যায়।'

শক্তিপদ বলল, 'ছিঃ মরবে কেন।'

তারাদাস আর হরিদাস বোঝা মাথায় বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে আগে আগে চলেছে। সরু পথ। ত্নদিকে গাছ গাছালি, ফাঁকে ফাঁকে গৃহস্থের বাড়ি। তারাদাস ডান হাতে একটা পুঁটুলি ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে। শক্তিপদ বলল, 'ওটা আবার কী।'

তারাদাস বলল, 'কয়েকটা পেঁপে দিলাম বেঁধে। আমাদের গাছের বড় বড় পেঁপে। বেশ স্বাদ আছে। যেতে যেতে পেকে যাবে। কলকাতায় এ জিনিস পাবেন না মামা।'

শক্তিপদ বলল, 'তা ঠিক।'

তারাদাস যেতে যেতে বলল, 'আমাদের জন্যে অত ভাববেন না মামা। মা আর ঠামা যত ভাবে আমি তত ভাবি না। চলেই যাবে কোন রকমে। দিদিও কিছু করবে, আমিও কিছু করব। তা ছাড়া খরচ অনেক কমিয়ে ফেলব। বাবা মাছের জন্যে ভারি ব্যয় করতেন। মাছ দেখলে আর লোভ সামলাতে পারতেন না। মাছের জন্যে আমি এক পয়সাও ব্যয় করব না। নদী নালা থেকে মেরে খাব—'

হরিদাস বলল, 'আমিও মারব। আমিও বঁড়শি বাইতে জানি।'

শক্তিপদ হাসল। যেন মাছের খরচটাই সংসারে সব। বলল, 'খবরদার কেউ জলে টলে নেবো না।'

হরিদাস বাহাদুরি দেখিয়ে বলল, 'আমরা সবাই সাঁতার জানি।'

ডাইনে মাঠ। মাঠের ধার দিয়ে রাস্তা। বেশ কড়া রোদ উঠেছে। শক্তিপদ এগোতে লাগল। আরো কিছুদূর গেলে নদী। খেয়া নৌকোয় নদী পার হবে। ওপারে স্টেশন।

ওরা দু ভাই ফের তার আগে আগে চলেছে। শক্তিপদ ভাবল, মরবে না হয়তো। কিন্তু পদে পদে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে। ওদের সেই অনির্দিষ্ট কালের দীর্ঘস্থায়ী জীবনযুদ্ধে, নিজের সংসারের বোঝা মাথায় করে কতখানি সহায়ক হতে পারবে শক্তিপদ, বলা সহজ নয়।

সমাপ্ত